তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

আলোর মিছিল

পঞ্চম খণ্ড

ডঃ আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী

আলোর মিছিল

পঞ্চম খণ্ড

মূল
ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)
বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ

অনুবাদ
মাওলানা ইবরাহীম মোমেনশাহী
মুহাদ্দিস: বাবুস সালাম মাদরাসা বিমান বন্দর, ঢাকা

সম্পাদনা
মাওলানা নাসীম আরাফাত
শিক্ষক, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৯।

মাকতাবাতুল আশরাফ
[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখকের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হে আল্লাহ! আমি নির্ভরযোগ্য সুনির্বাচিত
তাবেঈদেরকে এমন প্রাণ উজার করে ভালোবাসি,
যার চেয়ে অধিক ভালো আমি প্রিয় রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবীদের
ছাড়া আর কাউকেই বাসি না।
সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমাকে
মহাত্রাসের দুর্দিনে 'এই দল' (তাবেঈগণ) অথবা
'ঐ দল' [সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)] -এর যে কোন
একজনের পাশে একটুখানি স্থান দিয়ো।
তুমি তো জানো! আমি শুধু তোমারই জন্য
তাদেরকে ভালোবাসি! ইয়া আকরামাল আকরামীন।

—আবদুর রহমান

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন কাহিনী "আলোর মিছিল" এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ হয়েছে অনেক দিন আগেই। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের কম্পোজ হয়ে প্রথম প্রুফ ও দ্বিতীয় প্রুফের কাজ শেষ হয়েছে তাও প্রায় বছর হতে চললো। কিন্তু ফাইনাল প্রুফ যেহেতু আমার মতো অকর্মন্যকে দেখতে হয়। তাই অনেক বেশী দেরী হয়ে গেলো। আগ্রহী পাঠক ও আমাদের শুভানুধ্যায়ীগণ যেভাবে এ গ্রন্থ্ প্রকাশের ব্যাপারে তাকীদ দিয়েছেন, অনুরোধ করেছেন। সেটা এ যুগে একান্তই বিরল।

আলহামদুলিল্লাহ! এখন খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ট খণ্ড প্রকাশ হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আর এ খণ্ডগুলোর প্রকাশনায় অনাকাংখিত বিলম্বের জন্য আমি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

অনুবাদ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা, তাহলো এ খণ্ডগুলো নবীনদের হাতে অনূদিত হলেও সম্পাদনা যেহেতু মজবুত ভাবে করা হয়েছে। তাই এ খণ্ডগুলো পূর্বের খণ্ডগুলোর মতো সুখপাঠ্য হবে ইনশা আল্লাহ্।

এ ছাড়া "আলোর কাফেলা" যা এ লেখকের সাহাবায়ে কেরামের জীবন সম্পর্কিত গ্রন্থ্। যার ১ম খণ্ড আমরা পূর্বেই প্রকাশ করেছি, অবশিষ্ট খণ্ডগুলো ও ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

মূল গ্রন্থ্ ও গ্রন্থ্কার সম্পর্কে দুটি কথা

মূল গ্রন্থ্কার বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক, গবেষক, লেখক মরহুম ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহঃ)। মূল গ্রন্থের নাম 'সুওয়ারুম্ মিন হায়াতিত্ তাবেঈন'। লেখক তাঁর কালজয়ী এই গ্রন্থে শুধু কেবল একান্ত সত্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোকেই স্থান দিয়েছেন। সুতরাং আরব বিশ্বে ব্যাপকহারে সমাদৃত ও বহুল পঠিত এই রচনা সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এটি সব ধরনের বাহুল্য, ভুল ও দুর্বল তথ্য মুক্ত একটি অমর ও অনবদ্য গ্রন্থ্।

এতদসত্ত্বেও উচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন এ গ্রন্থের হৃদয় জুড়ানো ভাষা ও আবেগ জাগানো এক অনন্য রচনাশৈলী পাঠককে আলোড়িত করে তীব্রভাবে। পাঠক কখনো হন মুগ্ধ, কখনো আবার ভীষণ বেদনাহত। কখনো তার হৃদয় কূলে আছড়ে পড়ে অনুশোচনার ঢেউ। কখনো ভেসে যায় তার দু'চোখের কূল। লেখকের অপূর্ব বর্ণনাভংগি পাঠককে বইয়ের পাতা থেকে একটানে তুলে নিয়ে যায় সেই সুদূর অতীতে, সোনালী যুগের এক সোনালী সকালের পবিত্র আসরে। এভাবেই এ গ্রন্থের জীবনীগুলো প্রত্যক্ষ করতে থাকেন স্বচক্ষে।

এই গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডে যেসব মহামনীষীর জীবন কথা আলোচিত হয়েছে, ইসলামে তাঁদেরকে আখ্যায়িত করা হয় 'তাবেঈন' বলে। তাঁদের নামের শেষে বলা হয় 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি'। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাঁর রুহের উপর।

মূলতঃ এ পৃথিবীর যাবতীয় কল্যাণকর ও উত্তম আদর্শের যিনি মূর্ত প্রতীক, যিনি সততা, সাধুতা, সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণকামিতাসহ যাবতীয় উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি মনুষ্যত্বের নির্মাতা, তিনি হলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যুগস্রষ্টা, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এই মহামানব মাত্র তেইশ বছরের নবী জীবনে আসমানী অহীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছিলেন এমন একদল মানুষ, যারা আজ পর্যন্ত এবং অনাগত ভবিষ্যতের মহাপ্রলয় পর্যন্ত এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাদুতুল্য শিক্ষা আর পরশপাথরতুল্য সান্নিধ্য যাদেরকে এনে দিয়েছিলো 'সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি'র বিরল সম্মান আর তাঁদের যুগকে দিয়েছিলো 'সোনালী যুগ'-এর আখ্যা। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ শিক্ষা ও সান্নিধ্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত 'তাঁরা' এবং তাঁদের 'যুগ' ছিলো 'বর্বর' বলে অভিযুক্ত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানদীপ্ত এইসব সহচর, যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা ও সান্নিধ্যের ঈমানী সুবাস নিয়েই যাদের মৃত্যু হয়েছিলো, তাঁদেরকেই বলা হয় সাহাবী। তাঁদের নামের শেষে বলতে হয় রাযিয়াল্লাহু আনহু বা আনহা'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর শিক্ষায় জীবনগড়ার একমাত্র মাধ্যম ছিলেন তাঁরই হাতে গড়া সাহাবী জামা'আত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাওয়ার ফলে তাবেঈগণ একমাত্র মাধ্যম সেই সাহাবী জামাআতকেই আঁকড়ে ধরেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় আলোকিত করে তোলেন নিজেদের জীবন ও মনন। কোন তাবেঈ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য পাননি। তাঁরা পেয়েছিলেন 'আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' -এর সরাসির শিক্ষা ও সাহচর্য। এজন্যই তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর হতে পারেননি, পেরেছিলেন তাঁর সহচরদের সহচর হতে। এভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পেলেও সাহাবায়ে কেরামের প্রচেষ্টায় তাবেঈদের মাঝেও নিখুঁতভাবে গড়ে ওঠে সমস্ত ঈমাণী গুণ ও বৈশিষ্ট্য। ফলে তাঁরাও দিনের আলো আর রাতের আঁধারে সমানভাবে আল্লাহকে ভয় করতেন। দুর্দিনে আর সুদিনে সমানভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। আমীর ও ফকীর, শাসক ও শাসিত সকলের সামনেই তাঁরা নির্ভীকভাবে হকের উচ্চারণ করতেন। এসব ঈমানী বৈশিষ্ট্যের কারণেই সাহাবীগণের পরে উম্মতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন তাবেঈগণের। যে কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। তিনি বলেছেন–

"আমার যুগটাই সর্বশ্রেষ্ঠ তারপর পরবর্তী যুগ তারপর তারও পরের যুগ..."

আমার ধারণা বর্তমান লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, নীচতা-হীনতা ও বর্বরতার এই ঘন অমানিশায় আচ্ছন্ন পৃথিবীতে 'আলোর মিছিল' আশার আলো ফুটাতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ!

বইটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করেছি। তারপরও কোন অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে, আমাদের জানানোর অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর এ সকল প্রিয় বান্দার জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত

তারিখ ঃ ২২শে রমযান ১৪২৭ হিজরী

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

১৩৬, আজিমপুর, ঢাকা

অনুবাদকের আরয

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

আল্লাহ্পাক মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণের জন্য ইসলাম ধর্ম দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে দ্বীন শিখে সে অনুপাতে আমল করে আল্লাহপাকের সন্তোষভাজন হয়েছেন।

তৎপরবর্তি স্তরের যে সকল সৌভাগ্যবান মানুষ হযরত সাহাবায়ে কেরামের (রাযি.) সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন, তাদেরকে শরীঅতের পরিভাষায় 'তাবেঈন' বলা হয়। তাদের গুণাবলী ও আখলাক অনেকটা হযরত সাহাবায়ে কেরামের মতোই ছিলো। এজন্য হযরত সাহাবায়ে কেরামের জীবন-চরিত পাঠ করলে যেমন ঈমান মযবুত হয়, আমলের আগ্রহ বাড়ে, তদ্রূপ তাবেঈদের জীবনকাহিনী পাঠেও ঈমান-আমলের উন্নতি হয়। সম্ভবত এ দিকটি লক্ষ্য করেই মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্ত্বাধিকারী যুগ সচেতন বিচক্ষণ আলেম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান ছাহেব "আলোর মিছিল" শীর্ষক তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী সিরিজ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

এ সিরিজের পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড অনুবাদের দায়িত্ব আমি অধমকে দেয়া হয়। বই প্রকাশের এ মূহুর্তটি আমার জন্য একদিকে যেমন আনন্দের, অপর দিকে খুব ভীতির ও বটে। কারণ এটাই হলো আমার জীবনের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ।

আল্লাহ্ পাকের নিকট দু'আ করি তিনি যেন এ অনুবাদকে পাঠকপ্রিয়তা দান করেন। আর যারা আমাকে দু'আ দিয়েছেন, হিম্মত জুগিয়েছেন তাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করেন।

বর্তমান গ্রন্থ এ সিরিজের পঞ্চম খণ্ড। আমি আমার সাধ্যমত এটিকে সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। এতদ সত্ত্বেও যদি কোথায়ও কোন অসংগতি দৃষ্টি গোচর হয়, তাহলে আমাকে জানালে শুধরে নিবো।

আল্লাহ্ পাক এই নগন্য খেদমত কবুল করে এর লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সবাইকে দুনিয়া-আখিরাতে উপকৃত করুন। আমীন!

বিনীত

মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম

মধুপুর, টাঙ্গাইল

সূচীপত্র

হযরত যাইনুল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রহ.)

আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলীর চেয়ে উত্তম কোন কোরাইশীকে আমি দেখিনি।

- ইমাম যুহরী (রহ.)

হযরত যাইনুল আবিদীন আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রহ.)

সে আলোকময় বৎসরে পারস্যসম্রাটদের ইতিহাসের সর্বশেষ পৃষ্ঠাটি মিটিয়ে ফেলা হয়েছে।

কারণ সে বৎসর পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বশেষ উত্তরাধিকারী সম্রাট ইয়াজদিগিরদ লাঞ্চিত অপমানিত হয়ে ও আশ্রয়হীনভাবে নিহত হয়েছে...

তার সেনাপতিগণ এবং তার প্রহরীরা নিহত হয়েছে, তার পরিবার-পরিজন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছে ...

বন্দীদেরসহ সমস্ত গনীমতের মাল মদীনায় নিয়ে আসা হয়েছে ...

সে মহান বিজয়ে যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা ছিল প্রচুর, তা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান ও দামী। সংখ্যায় এর চেয়ে বেশী ও এর চেয়ে দামী যুদ্ধবন্দী মদীনাবাসী ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি।

বন্দীদের মধ্যে সম্রাট ইয়াজদিগিরদের তিন কন্যাও ছিল।

*   *   *

মদীনার লোকজন যুদ্ধ বন্দীদের ক্রয় করতে এগিয়ে এলো, এবং অল্পক্ষণের মধ্যে নিজ নিজ পছন্দমত বন্দী ক্রয় করে বাইতুল মালে তার মূল্য পরিশোধ করে দিল। এভাবেই সব বন্দী শেষ হয়ে গেল। বাকী রইল শুধু সম্রাট ইয়াজদিগিরদের তিন কন্যা।

নারীদের মধ্যে তারা ছিল সব চেয়ে সুন্দরী সব চেয়ে রূপসী
তাদের মুখমন্ডল ছিল সব চেয়ে উজ্জ্বল
তাদের যৌবন ছিল সব চেয়ে সজিব

যখন তাদেরকে বিক্রির জন্য পেশ করা হল তখন অপমান ও লাঞ্ছনায় তারা মাথা নিচু করে ফেলল, এবং মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল...

অনুশোচনা ও আফসোসে তাদের চোখ ছল্ ছল্ করে উঠল, চোখ থেকে অশ্রু উথলে উঠল

তাদের এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে হযরত আলী (রাযি.) এর হৃদয় বিগলিত হল।

তাঁর আশা ছিল যেন এমন কেউ তাদের ক্রয় করে যে যথাযথভাবে তাদের তত্ত্বাবধান করবে এবং সুন্দরভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

আর এতে তো আশ্চর্য্যেরও কিছু নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এরশাদ করেছেনঃ

'তোমরা পরাজিত সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি দয়া করো'

তাই তিনি হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ

ঃ হে আমীরুল মুমিনীন!

এরা সম্রাটের কন্যা। সম্রাটের কন্যাদের সাথে অন্যান্য বন্দীদের মত আচরণ করা যাবে না

হযরত উমর (রাযি.) তখন বললেন ঃ আপনি সত্য বলেছেন

ঃ কিন্তু কিভাবে কি করা যায়?

হযরত আলী (রাযি.) বললেন ঃ তাদের চড়া মূল্য নির্ধারণ করুন। তাদেরকে সে নির্ধারিত মূল্যে যারা ক্রয় করবে ক্রেতা সকলের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে এরা গ্রহণ করবে এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিন।

উমর (রাযি.) তাঁর কথায় খুশী হলেন এবং এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং তাই করলেন ...

তখন তাদের একজন গ্রহণ করল হযরত উমর (রাযি.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহকে।

দ্বিতীয়জন গ্রহণ করল হযরত আবূ বকরের ছেলে মুহাম্মাদকে।

আর তৃতীয়জন তার নাম ছিল শাহযিনান, সে গ্রহণ করল আলী (রাযি.) এর পুত্র নবী- দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাযি.) কে।

* * *

শাহযিনান রে তিনি সৌভাগ্যবর্তী হলেন এবং হযরত হুসাইন (রাযি.) তাঁে ইসলাম গ্রহণ করলেন, তার ইসলাম সৌন্দর্যমন্ডিত হল ...

সঠিক দীন গ্রহণ ক ক গোলামীর জিঞ্জির থেকে আযাদ করে দিলেন।

তারপর হযরত হুসাইন (রাযি.) তাঁকে বিয়ে করে নিলেন। ফলে বাদী থেকে এখন তিনি তাঁর থেকে স্ত্রীতে পরিণত হলেন এবং স্বাধীনতা লাভ করে ধন্য হলেন।

তারপর তিনি অতীতের মূর্তিপূজার সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই তার পূর্বনাম 'শাহযিনান' থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। এখন তার নাম হল 'গাযালা' । গাযালা নামেই এখন তাকে ডাকা হয়।

'গাযালা' সর্বোত্তম এবং রাজকন্যাদের উপযুক্ত স্বামী পেয়ে ধন্য হলেন।

এখন তাঁর কোন আশা আকাংখা নেই। শুধু একটি সন্তান লাভ করাই তাঁর মনের বাসনা।

তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে একটি সন্তান দিয়ে তার আশা পূরণ করলেন। সুন্দর চেহারা এবং উজ্জ্বল মুখমন্ডলের অধিকারী একটি ছেলে সন্তান তিনি প্রসব করলেন। তাই বরকত স্বরূপ দাদার নামে নাম রাখলেন 'আলী' । আলী ইবনে হুসাইন।

কিন্তু ছেলের চাঁদমুখ দেখে গাযালার সমগ্র সত্তায় যে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল তা বেশী দিন স্থায়ী হল না

কারণ; তিনি জ্বরাক্রান্ত হয়ে আপন পালন কর্তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন দূরে বহুদুরে। নিজের সন্তানের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ তাঁকে দেয়া হয়নি।

* * *

আলী এখন মাতৃহীন এক অসহায় শিশু। তাই শিশু আলীর লালন-পালনের জন্য 'এক বুক' মাতৃস্নেহ নিয়ে এগিয়ে এলেন তারই পিতার এক বাদী। তিনি তাকে গভীরভাবে ভালবাসলেন। একজন মা আপন সন্তানকে যেমন ভালবাসে তার চেয়েও বেশী ভালবাসলেন তাকে

এবং একজন মা নিজ সন্তানকে যেমন তত্ত্বাবধানে রাখেন তার চেয়েও বেশী করে তিনি শিশু আলীর দেখা শুনা করছিলেন ...

তাই আলী ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলেন অথচ সে বুঝতেও পারল না যে সে মাতৃহারা।

* * *

আলী ইবনে হুসাইন পূর্ণ যৌবনে এখনও পর্দাপন করেননি তা সত্ত্বেও তিনি প্রচন্ড আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে ইলম অর্জনে ব্রতী হলেন।

তার প্রথম মাদরাসা হল তার গৃহ। কতইনা চমৎকার তার মাদরাসা ...

তার প্রথম মুআল্লিম হলেন তার পিতা। কতইনা মহান তার শিক্ষক

আর তার দ্বিতীয় মাদরাসা ছিল মসজিদে নববী।

সে কালে মসজিদে নববী অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের দ্বারা ছিল তরঙ্গায়িত এবং প্রথম সারির তাবেয়ীনদের দ্বারা ছিল উত্তাল।

তারা সকলেই সাহাবায়ে কেরামের ফুলের মত প্রস্ফুটিত সন্তানদের জন্য নিজেদের হৃদয় খুলে দিতেন এবং তাদেরকে কিতাবুল্লাহ পড়াতেন...

তাদের ফকীহ বানাতেন

জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করতেন

তাদের কাছে নবীজীর হাদীস বর্ণনা করতেন

সীরাতেরাসূল এবং নবীজীর জিহাদের বিস্ময়কর ঘটনাবলি শুনাতেন...

আরবদের কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং কবিতার সৌন্দয্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন ...

এবং তাদের কোমল হৃদয়কে ভরে দিতেন আল্লাহ্র ভালবাসা, ভয় ও তাকওয়া দ্বারা ...

যার ফলে তারা এমন আমলদার আলেম হয়েছেন । হয়েছেন হেদায়েতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক।

* * *

কিন্তু আলী ইবনে হুসাইনের হৃদয় কিতাবুল্লাহ প্রতি যেমন আকৃষ্ট ছিল অন্য কিছুর প্রতি তেমন আকৃষ্ট ছিল না ...

কিতাবুল্লাহর জান্নাতের প্রতিশ্রুতি এবং জাহান্নামের সর্তকবাণীতে যেমন তার শিরা উপশিরাগুলো অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠত, অন্য কিছুতে তেমন হত না

তাই জান্নাতের আলোচনা সম্বলিত কোন আয়াত যখন তিনি তিলাওয়াত করতেন তখন আগ্রহাতিশয্যে তার হৃদয় যেন জান্নাতের দিকে উড়ে যেতে চায়তো

আর যখন জাহান্নাম এবং আল্লাহর আযাব-গজব সম্বলিত কোন আয়াত যখন তিনি তিলাওয়াত করতেন তখন তিনি উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতেন। যেন তার পাজরের মাঝে জাহান্নামের আগুন রয়েছে।

* * *

যৌবন ও ইলমের পূর্ণতায় এখনও তিনি পদার্পণ করেননি। তদুপরি ইবাদত ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে বনী হাশিমের যুবকদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

তিনি চরিত্র মাধুরী ও ইজ্জত সম্মানে ছিলেন তাদের উচ্চে...

এবং তিনি সবচেয়ে বেশী নেক আমল ও ইহসান কারী

এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইলমের অধিকারী ছিলেন...

ইবাদত ও তাকওয়ার এমন সুউচ্চ মার্গে তিনি উপনিত হয়েছেন যে, উযূও নামাযের সময় তাঁর গায়ে প্রকম্পন সৃষ্টি হত। যখন এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল তখন তিনি বললেন ঃ

ধ্বংস তোমাদের !!

আমি কার সামনে দন্ডায়মান হবো যেন তোমরা তা জানইনা

কার কাছে আমি আমার হৃদয়ের আকুতি জানাতে চাই তোমরা যেন তার খবরই রাখ না

*　　*　　*

তাকওয়া, ইবাদত ও দীনের বৈশিষ্ঠাবলিতে তাঁর দৃঢ়তা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে মানুষ তাকে 'যাইনুল আবিদীন" (ইবাদতকারীর সৌন্দর্য) বলে ডাকতে লাগল।

এমন কি মানুষ তাঁর আসল নামটাই ভুলে যাবার উপক্রম হল এবং তাঁর আসল নামের উপর তার গুণ বিষয় উপাধীকে প্রাধান্য দিল।

দীর্ঘ সিজদা ও সিজদায় আত্মসমাহিত হবার ক্ষেত্রে তার অবস্থা ছিল এমন যে, মানুষ তাকে 'সাজ্জাদ' (অধিক সিজদাকারী) বলে ডাকতে শুরু করল ...

কলবের সাফায়ী ও হৃদয়ের পরিছন্নতায় তিনি এমন পর্যায়ে পৌছেছেন যে, মানুষ তাকে 'যাকী' বলে সম্বোধন করতে লাগল।

*　　*　　*

যাইনুল আবিদীন নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন যে দু'আই হল ইবাদতের মগজ। ইবাদতের প্রাণ

কাবার গিলাফ ধরে দু'আ করা ছিল সব চেয়ে প্রিয়তম কাজ। তাই কতবার যে প্রাচীন ঘর বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরে দু'আ করেছেন আর বলেছেন ঃ

হে আমার পালনকর্তা! আপনি তো আমাকে আপনার অফুরন্ত রহমত দান করেছেন,

প্রচুর পরিমানে আমাকে নিয়ামত দান করেছেন। তাই আমি এখন কোনরূপ ভয়-ভীতি ছাড়াই নিরাপদে আপনার কাছে দু'আ করতে পারছি...

কোনরূপ আশংকা ব্যতীত একবারে নিঃশংকচিত্তে আপনার কাছে প্রার্থনা করতে পারছি ...

হে আমার রব! আমি ঐ ব্যক্তির মত অসীলা ধরে দু'আ করছি যে আপনার রহমতের মুখাপেক্ষী

আপনার 'হক' আদায় করতে যে অপারগ হয়েছে ...

সুতরাং অনুগ্রহ করে আমার দু'আ কবুল করুন।

আমি তো বিপদগ্রস্ত, অসহায়। আপনি ছাড়া আমার মুক্তির জন্য আর তো কেউ নেই।

কাবার গিলাফ ধরে তিনি এমনই দু'আ করতেন।

* * *

একবার তাউস ইবনে কায়সান দেখলেন যাইনুল আবিদীন প্রাচীনতম ঘর বাইতুল্লাহর ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, মরনাপন্ন ব্যক্তির মত কাঁপছেন, রুগ্ন ব্যক্তির মত তিনি ক্রন্দন করছেন এবং অসহায় ব্যক্তির মত দু'আ করছেন।

তাই তাউস ইবনে কায়সান তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন তিনি দু'আ থেকে ফারেগ হলেন এবং কান্না বন্ধ করলেন তখন তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

হে নবীজীর সন্তান! আমি আপনার অবস্থা দেখেছি। আপনার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে। আমি আশা করি সে গুণগুলো আপনাকে সকল প্রকার ভয়ভীতি থেকে রক্ষা করবে।

যাইনুল আবিদীন তখন বললেন ঃ হে তাউস! সে গুণ তিনটি কি? যা আপনি আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন?

তাউস বললেন ঃ একটি হল আপনি নবীজীর বংশধর তার প্রপৌত্র...

দ্বিতীয় গুণটি হল আপনি আপনার পিতামহের সুপারিশ লাভ করবেন...

আর তৃতীয় গুণটি হল আপনার উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত

যাইনুল আবিদীন তখন বললেন, হে তাউস। নবীজীর সাথে আমার সম্পর্ক আমাকে নিরাপত্তা দিবে না। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَاأَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمِئِذٍ

অর্থাৎ যখন শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে তখন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না।

আর আমার পিতামহের শাফায়াতের কথা আমি কি বলব আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই তো বলে দিয়েছেন ঃ

وَلَايَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى

অর্থাৎ আল্লাহ যার ব্যাপারে রাজি তারা তার জন্যই সুপারিশ করবেন।

আর আল্লাহর রহমত সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ

اِنَّ رَحمةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

*　　*　　*

তাকওয়ার সাথে সাথে তিনি অর্জন করেছিলেন শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা, ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ

যার ফলে জীবনচরিতের গ্রন্থগুলি তাঁর বিমুগ্ধকর ঘটনাবলী দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং মানুষের মাঝে তাঁর সম্মানজনক অবস্থানের চিত্তার্কষক ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতাকে সমুজ্জ্বল করেছে

এক বারের ঘটনা। হাসান ইবনে হাসান বর্ণনা করেন ঃ আমার আর আমার চাচাত ভাই যাইনুল আবিদীনের মধ্যে সামান্য মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তাই আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি কতিপয় সঙ্গীর সাথে মসজিদে ছিলেন।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বললাম। কিছুই বাদ রাখলাম না। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। কোন কথা বললেন না

তারপর আমি চলে আসলাম

রাতে তিনি আমার বাড়ী আসলেন এবং দরজায় কড়া নাড়লেন, রাতের বেলা কে আসল দেখার জন্য আমি দরজার দিকে গেলাম।

দরজায় গিয়েই দেখি যাইনুল আবিদীন   তখন আমার কোন সন্দেহ রইল না যে তিনি আমার থেকে প্রতিশোধ নিতে এসেছেন

কিন্তু কি আর্শ্চয তিনি কিছু করলেন না। শুধু বললেন, হে আমার ভাই! তুমি যা কিছু বলেছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন

আর যদি তা সত্য না হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে ক্ষমা করে দেন

তারপর আমাকে সালাম দিয়ে চলে গেলেন

আমি তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম এবং তাকে বললাম ঃ আল্লাহর কসম আপনি যা অপছন্দ করেন তা আর কখনও আমি করব না।

আমার কথায় তিনি নরম হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ তুমি আমার সম্পর্কে যা বলেছ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।

*   *   *

আরেক দিনের ঘটনা। মদীনার জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, যাইনুল আবিদীন মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং তাকে লক্ষ্য করে কটুকথা বলতে লাগলাম, অথচ এর কোন কারণ

ছিল না। ফলে লোকজন আমাকে ধরে আমার থেকে প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার দিকে এগিয়ে এলো।

যদি তারা আমার থেকে প্রতিশোধ নিতে পারত তাহলে আমাকে একেবারে পিষে না ফেলে ছাড়তো না

তখন যাইনুল আবিদীন লোকজনের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমরা থাম, তারা থেমে গেলো

এদিকে আমি তো ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেলাম। আমার ভয়-বিহবল অবস্থা দেখে তিনি হাসি মুখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, আমাকে নিরাপত্তা দিলেন। আমাকে শান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর বললেন ঃ

তুমি যা জানতে পেরেছ সে হিসাবেই আমাকে গালি দিয়েছ আর তোমার থেকে যা গোপন রয়েছে তাতো আরও মারাত্মক।

তারপর আমাকে বললেন ঃ তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে যা পূরণে আমি সহায়তা করতে পারি?

তখন আমি আর কি বলব লজ্জায় একেবারে এতটুকুন হয়ে গেলাম কোন কথাই বলতে পারলাম না

আমার লজ্জাবনত চেহারা দেখে তিনি আমাকে তাঁর গায়ের চাদর দিয়ে দিলেন এবং আমাকে এক হাজার দিরহাম দিতে নির্দেশ দিলেন।

এরপর যখনই তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হত আমি বলতাম ঃ আমি নিঃশংকচিত্তে একথার সাক্ষ্য দেই যে, আপনি প্রকৃতপক্ষেই নবীজীর বংশধর।

হযরত যাইনুল আবিদীনের এক আযাদকৃত গোলাম বলেন ঃ

“আমি ছিলাম আলী ইবনে হুসাইনের ক্রীতদাস। তিনি কোন এক প্রয়োজনে আমাকে কোথাও পাঠালেন। কিন্তু কাজ সেরে আসতে আমার বেশ বিলম্ব হয়ে গেল। আমি যখন তাঁর কাছে আসলাম তিনি রাগ করলেন এবং আমাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করলেন

চাবুকের আঘাতে আমি কেঁদে ফেললাম। তখন আমার প্রচন্ড রাগ উঠেছিল। কারণ আমার পূর্বে আর কখনও তিনি কাউকে মারেননি। তাই আমি রাগতঃ স্বরে বললাম ঃ

আল্লাহকে ভয় করুন, হে আলী ইবনে হুসাইন!

আপনি নিজের কাজে আমাকে পাঠালেন আর সে কাজ করা সত্ত্বেও আমাকে মারলেন?

আমার কথায় তিনি কেঁদে ফেললেন। বললেন ঃ যাও, তুমি মসজিদে নববীতে গিয়ে দুরাকাত নামায পড়ে আমার জন্য এই দু'আ কর...

হে আল্লাহ! তুমি আলী ইবনে হুসাইনকে ক্ষমা করে দাও।

তুমি যদি মসজিদে নববীতে গিয়ে এ কাজ কর তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আযাদ।

আমি তাই করলাম। মসজিদে গিয়ে নামায পড়লাম এবং তার জন্য দু'আ করলাম।

তারপর আমি একজন পূর্ণ স্বাধীন মানুষ হিসেবে তার কাছে ফিরে এলাম

* * *

আল্লাহ তা'আলা যাইনুল আবিদীনকে অঢেল ধন-সম্পদ দান করেছিলেন

কেননা তাঁর ছিল লাভজনক ব্যবসা

ছিল ফসলী জমী...

তাঁর গোলামরা তাঁর এই ব্যবসা বানিজ্য ও কৃষিকাজের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

তাঁর ব্যবসা এবং ফসলের জমি তাঁর জন্য প্রভূত কল্যাণ ও প্রচুর ধন সম্পদ বয়ে এনেছিল

কিন্তু এই ধনাঢ্যতা যাইনুল আবিদীনকে অহংকারী বানায়নি

এই অফুরন্ত নিয়ামত তাকে আত্মম্ভরি করেনি

পার্থিব জগতের এই সম্পদকে তিনি পরলৌকিক সাফল্যের মাধ্যম বানিয়েছিলেন

যার ফলে তাঁর সম্পদ হয়েছিল এক নেককার বান্দার জন্য কল্যাণকর সম্পদ।

নেককাজে গোপনে দান-খয়রাত ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ।

তাই তো যখন মদীনায় রাত নেমে আসত, তখন তিনি তার শীর্ণকায় পিঠে আটার বস্তা নিয়ে রাতের আঁধারে রাস্তায় বের হতেন। অথচ তখন মানুষ থাকত গভীর ঘুমে অচেতন...

আটার বস্তা নিয়ে তিনি মদীনার অলি-গলিতে ঘুরে ফিরতেন এবং যারা মানুষের গায়ে পড়ে কিছু চায় না তাদেরকে দান করতেন এবং গোপনে তাদের ঘরে আটা রেখে আসতেন।

ফলে মদীনার অনেক মানুষ সুখ স্বাচ্ছন্দে বসবাস করত অথচ তারা জানতেও পারত না, প্রতিদিন এতো প্রচুর ভাল খাবার কোত্থেকে আসে।

কিন্তু যাইনুল আবিদীনের ইন্তেকালের পর যখন এ ধারা বন্ধ হয়ে গেল তখন তারা বুঝতে পারল যে, যাইনুল আবিদীনই তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন।

যাইনুল আবিদীনকে যখন গোসল দেয়া হচ্ছিল তখন গোসলদান কারীরা তাঁর পিঠে কালো কালো দাগ দেখতে পেল। তারা জিজ্ঞেস করল, এ কিসের দাগ?

যারা জানতেন তারা বললেন! তিনি রাতের অন্ধকারে পিঠে আটার বস্ত া বহন করে মদীনার শত শত গৃহে যেতেন। এগুলো সেই আটার বস্তা বহন করার দাগ.।

* * *

তার গোলাম আযাদ করার ঘটনা ছিল আরও আশ্চর্যজনক। মুসাফিররা তার গোলাম আযাদ করার নানা কাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছিল

কারণ তাঁর এসব ঘটনা ছিল কল্পনার ও অতীত

মানুষের জ্ঞান সীমা অতিক্রম করেছিল তাঁর এসব ঘটনা। তাইতো আমরা দেখি কোন গোলাম যদি ভাল কাজ করত তাহলে ভাল কাজের বিনিময়ে তাকে আযাদ করে দিতেন

এমনিভাবে কোন গোলাম যদি খারাপ কাজ করে তাওবা করত তাহলে তার তাওবার কারণে তাকে আযাদ করে দিতেন

যার ফলে তাঁর গোলাম আযাদ করার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রচুর। অনেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এক হাজার গোলাম আযাদ করেছিলেন

তিনি কোন বন্দীকে বা গোলামকে এক বছরের বেশী সময় রাখতেন না।

তিনি সাধারনত ঈদুল ফিতরের রাতে বেশী গোলাম আযাদ করতেন। সেই মুবারক রাতে অনেকের কাঁধ থেকে গোলামীর শৃংখল মুক্ত করে দিতেন।

তাদেরকে আযাদ করবার আগে বলতেন, তোমরা কিবলামুখি হয়ে বস এবং বল ঃ

হে আল্লাহ! আলী ইবনে হুসাইনকে ক্ষমা করে দাও।

তারপর তাদেরকে পথ খরচ দিয়ে বিদায় করে দিতেন। ফলে তাদের ঈদ আনন্দ দুই আনন্দে পরিণত হত। তাদের ঈদ দুটি ঈদে পরিণত হত। এক হল ঈদের আনন্দ, আরেক হল আযাদীর আনন্দ।

* * *

হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রহ.) মানুষের মনের মনিকোঠায় এমন একটি আসন করে নিয়েছিলেন যার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধার আসন সমকালীন কোন ব্যক্তি লাভ করতে পারেনি

বাস্তবিকই মানুষ তাঁকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল

প্রকৃত অর্থেই তাঁকে যারপর নাই সম্মান করত

এবং তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছিল

তাঁকে এক নজর দেখার জন্য প্রচন্ড আগ্রহ পোষন করত

তাই তো যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন অথবা ঘরে প্রবেশ করতেন তখন মানুষ তার দর্শন লাভের জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকত।

অথবা তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হতেন কিংবা মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন মানুষ তার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকত।

* * *

হিসাম ইবনে আব্দুল মালিক ছিলেন ভাবি গর্ভনর । তিনি একবার চাকর বাকর ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হজ্জ করতে এলেন

তিনি যখন তাওয়াফ করতে ও হাজরে আসওয়াদকে চুমো দিতে এগিয়ে এলেন

তখন সেনাবাহিনী লোকজনকে সর্তক করে দিচ্ছিল এবং তার জন্য রাস্তা খালি করে দিচ্ছিল

কিন্তু একজন মাত্র মানুষ তার দিকে তাকালেন না এবং তাদের জন্য রাস্তাও ছেড়ে দাঁড়ালেন না

কারণ এতো আল্লাহর ঘর

আর সমস্ত মানুষই আল্লাহর বান্দা

অতএব রাস্তা ছাড়ার কোন প্রশ্নই আসে না

ঠিক এমন সময় দূর থেকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবারের ধ্বনি শোনা গেল

আওয়াজ শুনে লোকজন সেদিক ঘাড় উচুঁ করে তাকাল।

সকলেই দেখতে পেল, একদল মানুষের মধ্যে হালকা-পাতলা গড়নের একজন লোক। পড়নে তাঁর লুঙ্গি, গায়ে চাদর, চেহারা খুবই উজ্জ্বল

স্থীরতা ও গাম্ভীর্যের যেন মূর্তপ্রতিক

কপালে তাঁর সিজদার স্পষ্ট আলামত

লোকজন তাঁকে দেখে রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে এবং সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে যাচ্ছে।

সারিবদ্ধ মানুষ গভীর আগ্রহ ও ভালবাসা নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছেন। হাটতে হাটতে তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং হাজরে আসওয়াদকে চুমো দিলেন।

এমন সময় এক ব্যক্তি হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের দিকে তাকাল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ

এই লোকটি কে? যাকে মানুষ এমনভাবে সম্মান করছে...

এবং তার প্রতি যারপরনাই ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে...

হিশাম তখন বললেন ঃ আমি তাকে চিনতে পারছি না।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন আরবের বিখ্যাত কবি ফারাজদাক। তিনি বলে উঠলেন ঃ

হিশাম যদি তাঁকে না চেনে, তো আমি তাঁকে চিনি এবং সমগ্র দুনিয়াবাসীও তাকে চিনে

তিনি হলেন নবীজীর প্রপৌত্র হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাযিঃ)

এরপর নিম্মোক্ত আবেগ মিশ্রিত কবিতাটি পাঠ করলেন ঃ

هَذَا الَّذِىْ تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطْاَتَهُ وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ

তিনিই তো সেই মহান ব্যক্তি 'বাতহা' যার চলার পথ চিনে,
"বাইতুল্লাহ" ও তাকে চিনে "হিল" "হারাম" ও তার পরিচয় জানে।

هَذَاابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللهِ كُلِّهِمُ   هَذَا التَّقِىُّ النَّقِىُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ

তিনি হলেন সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবের সন্তান। তিনি হলেন খোদাভীরু, পূত পবিত্র , ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী এক মহান ব্যক্তি।

هَذَاابْنُ فَاطِمَةٍ اِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ   بِجَدِّهِ اَنْبِيَاءُ اللهِ قَدْ خُتِمُوْا

তিনি তো নবী-দুহিতা ফাতেমার সন্তান। তার পিতামহের মাধ্যমেই তো নবী প্রেরণের চিরন্তন ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

فَلَيْسَ قَوْلُكَ من هَذَا بِضَائِرِهِ   العُرْبُ تَعْرِف من اَنْكَرْتَ و الْعَجَمُ

অতএব আপনার এই কথা জিজ্ঞেস করা "যে, কে তিনি "

তার কোন ক্ষতি করবে না। কারণ আপনি যাকে

চিনতে পারছেন না, আরব আজমের সবাই তাঁকে চিনে।

كِلْتَا يَدَيْهِ غِيَاثٌ عَمَّ نَفْعُهُمَا   يَسْتَوْ كِفَانِ و لَا يَعْرُوْ هُمَا عَدَمُ

ঐতো তাঁর দানশীল দু'হাত যার কল্যাণ ছড়িয়ে আছে ব্যাপকভাবে। মানুষ তাঁর দানই কামনা করে তার দান কখনও নিঃশেষ হয় না।

سَهْلُ الْخَلِيْقَةِ لَا تُخْشَى بَوَادِرُهُ   يَزِيْنُهُ اثْنَانِ حُسْنُ الْخُلْقِ وَ الشِّيَمُ

তিনি ছিলেন নম্র স্বভাবের মানুষ তার পক্ষ থেকে কঠোরতার কোন আশংকা ছিলনা। দুটি বিষয় তার জীবনকে করেছে সুশোভিত। একটি হল তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুরী অপরটি তার উত্তম ব্যবহার।

مَا قَالَ لَا قَطُّ اِلَّا فِى تَشَهُّدِهِ   لَوْ لَا التَّشَهُّدُكَانَتْ لَاءَهُ نَعَمُ

তিনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ব্যতীত কখনও মুখে "না" বলেননি, যদি তাশাহুদ না হত তাহলে তার "না" "হ্যা" তে পরিণত হত।

عَمَّ الْبَرِيَّةَ بِالْاِ حْسَانِ فَانْقَشَعَتْ   عَنْهَا الْغَيَاهِبُ والْاِ مْلَاقُ و الْعَدَمُ

তার দান অনুগ্রহ ছিল ব্যাপক যার ফলে সকল অন্ধকার দারিদ্র ও মুখাপেক্ষিতা দূর হয়ে গিয়েছিল।

اِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا   اِلَىٰ مَكَارِمِ هٰذَا يَنْتَهِى الْكَرَمُ

যখন কোন কোরাইশ তাঁকে দেখে তখন বলে ওঠে, ইজ্জত,
সম্মান, মান ও মর্যদা তাঁর কাছে এসেই পূর্ণতা লাভ করেছে।

يُغْضِى حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ   فَمَا يُكَلَّمُ اِلَّا حِيْنَ يَبْتَسِمُ

তিনি ছিলেন লজ্জাশীল, লজ্জায় মাথা নত করে রাখতেন আর
মানুষ তাঁর ভয়ে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারত না।
আর তিনি সব সময় মুচকি হেসে কথা বলেন।

بِكَفِّهِ خَيْزُرَانٌ رِيْحُهُ عَبِقٌ   مِنْ كَفِّ اَرْوَعَ فِى عِرْنِيْنِهِ شَمَمُ

তার হাতে থাকে দুটি ছড়ি যা থেকে সুগন্ধি ছড়ায়...
সম্ভ্রান্ত বুযুর্গ ব্যক্তির উন্নত নাসিকার অধিকারী তিনি

مُشْتَقَّةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ نَبْعَتُهُ   طَابَتْ مَغَارِسُهُ والْخِيمُ وَالشِّيَمُ

তিনি হলেন নবীজীর বংশধর যার মূল ছিল উত্তম
যার স্বভাব এবং চরিত্র ছিল উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা নবীজীর এ প্রপৌত্রের প্রতি সন্তষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট রাখুন

নিশ্চয় তিনি ছিলেন ঐ ব্যক্তির অনন্য প্রতিচ্ছবি যে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে।

তিনি আল্লাহর শাস্তির ভয়ে সর্বদা নফসকে কঠোর শাসনে রাখতেন।

এবং আল্লাহর সওয়াব ও বিনিময়ের আশায় নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন।

হযরত আবু মুসলিম আল-খাওলানী (রহ.)

আবু মুসলিম ইবাদতের মধ্যে নিজেকে এমন ভাবে বিলিন করে দিয়েছেন যে নিজেই বলতেন 'যদি আমি স্বচক্ষে জান্নাত অথবা জাহান্নাম দেখতে পাই তাহলে তা আমার ইবাদতকে এতটুকু পরিমাণ বৃদ্ধি করবে না'।

- উসমান ইবনে আলী ইবনে আতেকা

হযরত আবু মুসলিম আল-খাওলানী (রহ.)

বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাতাসের গতিতে সমগ্র জাযিরাতুল আরবে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল।

তাই শয়তান আসওয়াদ আনাসীকে ঈমান পরিত্যাগ করে পুনরায় কুফরে ফিরে আসার জন্য প্ররোচনা দিতে শুরু করল, এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ইয়ামানে তার কওমের কাছে নবুওয়তের দাবী করার জন্য কুমন্ত্রণা দিতে লাগল।

* * *

আসওয়াদ আনাসী ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সুগঠিত দেহের অধিকারী। হৃদয়টা ছিল তার কুলষিত। দুষ্কর্ম ও অনিষ্টতা ছড়াতে ছিল পারঙ্গম।

জাহেলী যুগে জ্যোর্তিবিদ্যায় সে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। এবং ভেল্কিবাজিতেও সে দক্ষতা অর্জন করেছিল...

সাথে সাথে সে ছিল সুদক্ষ বাগ্মী। আকর্ষণীয় যক্তৃতার অধিকারী। অসাধারণ মেধাবী। এবং তার আজগুবি কাজ কর্ম ও কথাবার্তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আকল বুদ্ধি নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় ছিল সে সিদ্ধহস্ত। নিজের টাকা পয়সা এবং উপঢৌকনের মাধ্যমে বিশিষ্টজনদের ভালবাসা লাভ করায় ও তার জুড়ি ছিল না।

সাধারণত সে জনসমক্ষে বের হত না। কিন্তু যখন বের হত তখন গোপনীয়তা ও গাম্ভীর্য দিয়ে নিজেকে আড়াল করে রাখার জন্য কালো চাদর পরিবৃত অবস্থায় বের হত।

* * *

শুকনো পাতায় আগুন যেমন দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে আসওয়াদ আনাসীর নবুওয়াতের দাওয়াতও সমগ্র ইয়ামানে ছড়িয়ে পড়ল। এক্ষেত্রে তার গোত্র তাকে সার্বিক সাহায্য সাহযোগিতা করল। তার গোত্র ছিল "বনী মাজহাজ" এর শাখা।

সেকালে বনী মাজহাজের ছিল সবচেয়ে বেশী শাখা। তারা ছিল সব চেয়ে বেশী শক্তিশালী ও সব চেয়ে বেশী প্রতাপশালী। এমনিভাবে তার মিথ্যার উদ্ভাবন শক্তি তার মেধাবী অনুসারী তাকে যথেষ্ঠ সাহায্য-সহযোগীতা করেছে।

সে নিজের দাবীর সত্যতায় মানুষকে বিশ্বাসী বানাবার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিল।

এ জন্য সে চর্তুদিকে তার গুপ্তচরদের ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারা মানুষের বিভিন্ন অবস্থা, সমস্যা ও তাদের গোপন বিষয়গুলি জেনে নিত।

তারা তাদের অন্তরের গোপন আশা-আকাংঙ্খা ব্যথা-বেদনা জানার চেষ্টা করত।

সাথে সাথে তারা লোকজনকে আসওয়াদ আনাসীর শরণাপন্ন হতে এবং তার কাছ থেকে সাহায্য চাইতেও পরামর্শ দিত।

যখনই লোকজন তার কাছে আসত তখনই সে প্রথমেই তাদের প্রয়োজনের কথা বলে দিত এবং প্রত্যেকেরই সমস্যাদি কথা জানিয়ে দিত।

মানুষকে বুঝাত, তাদের গোপন বিষয় সম্পর্কেও সে জ্ঞাত। এমনকি তাদের অন্তরে লুকায়িত বিষয়গুলি সম্পর্কেও সে অবগত।

এছাড়াও তাদের সামনে এমন আজগুবি বিষয় পেশ করত, যা মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও চিন্তা-চেতনাকে পেরেশান করে দিত।

ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তার ব্যাপারটি ব্যাপক আকার ধারণ করল। তার প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল

তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল

তাই তাদের কে নিয়ে সে ইয়ামানের রাজধানী 'সনআয়' আক্রমণ করল এবং তা জয় করে নিল। তারপর সনআ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ করতে লাগল

ফলে হাযরামাউত ও তায়েফের মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল তার অনুগত হল।

বাহরাইন ও এডেনের মধ্যবর্তী অঞ্চল তার পদানত হল।

* * *

আসওয়াদ আনাসীর দাওয়াত যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং দেশ ও দেশবাসী তার অনুগত হল

তখন সে তার প্রতিপক্ষদের খুজঁতে লাগল। যাদের কে আল্লাহ তা'আলা মজবুত ঈমানের দৌলত দান করেছেন

এবং তাঁর নবীর প্রতি দান করেছেন সৃদৃঢ় একীন

আর যাদের দান করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য

এবং দান করেছেন প্রকাশ্যে সত্যপ্রকাশের ক্ষমতা ও বাতিলের মুকাবিলায় দৃঢ় প্রত্যয়

তাদের কে খুঁজে বের করে নির্দয়ভাবে তাদের উপর চড়াও হল এবং তাদেরকে অবর্ণনীয় কঠোর শাস্তি দিল।

এমন মহান ব্যক্তিদের শীর্ষে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ছাওর। যার উপনাম ছিল আবূ মুসলিম আল খাওলানী

* * *

আবূ মুসলিম আল খাওলানী ছিলেন দীনের উপর অটল অবিচল এক প্রত্যয়ী ব্যক্তি

সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী

সত্য প্রকাশে নির্ভিক

একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাই তিনি পার্থিব জগত ও তার চাকচিক্য থেকে নিজেকে সম্পুর্ণরূপে গুটিয়ে নিয়েছেন, পার্থিব জগতের ভোগ্য সামগ্রী ও আরাম আয়েশের প্রতি তিনি ছিলেন একেবারেই নির্মোহ ...

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষকে আল্লাহর প্রতি ডাকার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন

চিরস্থায়ী জীবনের মুকাবিলায় ক্ষণস্থায়ী জীবন কে তিনি বিক্রী করে দিয়েছেন

ফলে মানুষ তাঁকে তাদের হৃদয় সিংহাসনের সর্বোচ্চ আসনে সমাসিন করল।

কারণ তারা আবু মসলিমের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল একটি পবিত্র আত্মা। আর দেখেছিল যে, আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেন।

* * *

আসওয়াদ আনাসী ইচ্ছা করল, আবু মুসলিমকে কঠোর শাস্তি দিতে।

যাতে করে যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করছে তাদের অন্তরে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদেরকে তার ধর্মে ফিরিয়ে আনে।

তাই সে সনআর কোন এক প্রশস্ত মাঠে শুকনো কাঠ জমা করে তাতে অগ্নিপ্রজ্বলিত করার নিদের্শ দিল ...

লোকজনকে ইয়ামানের ফকীহ ও আবেদ আবু মুসলিম খাওলানীর তাওবা ও তার নবুওয়াত স্বীকারোক্তির অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আহবান করল।

নির্ধারিত সময়ে আসওয়াদ আনাসী সেই মাঠের দিকে এগিয়ে এলো, যা মানুষে মানুষে ভরে একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

তাকে ঘিরে রেখেছিল আসওয়াদ আনাসির চেলাচামুন্ড তার শীর্ষস্থানীয় অনুসারীরা।

তাকে বেষ্টন করে ছিল তার দেহরক্ষী ও সেনা বাহিনীরা।

অগ্নিকুন্ডের সামনে রাখা বিশালাকৃতির কুরসীতে সে উপবেশন করল।

এমন সময় জন সমক্ষে আবু মুসলিম খাওলানীকে বন্দী করে নিয়ে আসা হল

যখন তাঁকে আসওয়াদ আনাসীর সামনে আনা হল তখন সেই দুরাচার মিথ্যাবাদী দম্ভভরে তার দিকে তাকাল

তারপর অত্যন্ত নির্দয় দৃষ্টি নিয়ে তার সামনে প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডের দিকে তাকাল

এরপর আবু মুসলিমের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি এমর্মে সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ?

আবু মুসলিম বললেন, হ্যাঁ আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

তিনি সমস্ত রাসূলের সরদার ও সর্বশেষ নবী

এবার আসওয়াদ আনাসী ভ্রুকুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল?

আবু মুসলিম তখন বললেন, আমি তোমার কথা শুনতে পারছিনা...

আসওয়াদ আনাসী তখন বলল ঃ তাহলে মনে রেখো আমি তোমাকে এই আগুনে নিক্ষেপ করব।

আবু মুসলিম তখন বললেন, তুমি যদি তা-ই কর তাহলে তোমার যে আগুনের ইন্ধন হল কাঠ তার মাধ্যমে আমি ঐ আগুন থেকে আত্মরক্ষা করব যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে পাষান-হৃদয় এবং কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা কখনও আল্লাহর নির্দেশের অন্যথা করেনা। তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয় তারা তাই সম্পাদন করে।

আসওয়াদ আনাসী তখন বলল, এক্ষনি তোমাকে আগুনে ফেলব না। আমি তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি। তুমি তোমার বিবেকের সাথে বুঝাপড়া করে দেখ।

এরপর আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কী সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?

আবু মুসলিম বললেন, হ্যাঁ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তাঁকে হেদায়েত ও সত্যদীনসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের চিরন্তন ধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

আসওয়াদ আনাসী তখন ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম। সে বলল, তুমি কি একথার সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল?

আবু মুসলিম বললেন, তোমাকে বলিনি যে, আমি বধির তোমার একথা আমি শুনছিনা?

আবু মুসলিমের কঠোর জবাব তার প্রশান্ত চিত্ত ও চাঞ্চল্যবিহীন অঙ্গ প্রতঙ্গ দেখে আসওয়াদ আনাসী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল

তখনই তাঁকে আগুনে নিক্ষেপের নির্দেশ দিতে চাইল,

এমন সময় তার শীর্ষস্থানীয় এক অনুসারী এগিয়ে এলো এবং কানে কানে বলল ঃ

আপনি তো জানেন, এই লোকটি পুঁত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী এবং তার দু'আও কবুল করা হয়

আর যে কঠিন বিপদের সময় আল্লাহকে ভুলে যায় না আল্লাহ তায়ালাও তার সাহায্য পরিত্যাগ করেন না...

কাজেই আপনি যদি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেন আর আল্লাহ তা'আলা তাকে মুক্তি দিয়ে দেন তাহলে এতদিন আপনি তিলে তিলে যে সৌধ গড়ে তুলেছেন এক মুহূর্তেই তা চুরচুর করে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

মানুষকে আপনি ঠেলে দিবেন আপনার নবুওয়াত অস্বীকারের দিকে

আর যদি সে আগুনে পুড়ে মারা যায় তাহলে মানুষ তাঁর ধৈর্য দেখে একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে যাবে

তাকে শহীদদের সারিতে তুলে নিয়ে আসবে

অতএব আপনি তার প্রতি দয়া করুন। এবং তাকে মুক্ত করে দিন। এবং তাকে এ রাজ্য থেকে বের করে দিন। তাকে এ শাস্তি দেন আপনি ও তাতে স্বস্তি পাবেন।

আসওয়াদ আনাসী তার এই পরামর্শ গ্রহণ করল এবং তাকে তৎক্ষনাৎ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিল।

* * *

নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে আসওয়াদ আনাসী তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল কিন্ত আগুন তাঁর জন্য শান্তিদায়ক ও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। যেমন ইবরাহীম (আ.) এর উপর হয়েছিল।

* * *

এরপর হযরত আবু মুসলিম খাওলানী মদীনার অভিমুখে রওয়ানা হলেন,

মনে মনে তিনি আশা পোষণ করে আসছিলেন, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।

কারণ নবীজীকে না দেখেই, তাঁর সংস্পর্শের আনন্দ লাভ ছাড়াই তিনি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন।

কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! মদীনার সন্নিকটে পৌছেই তিনি সংবাদ পেলেন, নবীজী ইন্তেকাল করেছেন।

এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

তাই তিনি নবীজীর ইন্তেকালে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। নবীজীর বিচ্ছেদ ব্যথা তার অন্তরের অন্তঃস্থলে মিশে গিয়েছিল।

* * *

আবূ মুসলিম মদীনায় পৌঁছেই মসজিদে নববীতে যাবার ইচ্ছা করলেন।

মসজিদে নববীতে গিয়ে দরজার কাছে উট বাঁধলেন

মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে রওজা শরীফে গেলেন এবং রওজায়ে আতহারে সালাম পেশ করলেন,

তারপর মসজিদের এক খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করলেন ...

যখন তিনি নামায থেকে ফারেগ হলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন, একেবারে তাঁর সামনে দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

আবু মুসলিম বললেন ঃ ইয়ামান থেকে

হযরত উমর (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সেই সাথীর খবর কী যাঁর জন্য আল্লাহর দুশমন অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল আর আল্লাহ তাকে নাজাত দিয়েছেন।

আবু মুসলিম বললেন আল্লাহর রহমতে তিনি ভাল আছেন...

হযরত উমর (রাযি.) তখন বললেন ঃ আল্লাহর কসম। আপনি কি সেই ব্যক্তি নন?

আবু মুসলিম বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।

হযরত উমর (রাযি.) তখন তার কপালে চুমো দিলেন বললেন ঃ

আপনি কি জানেন আল্লাহর দুশমন এবং আপনার দুশমনের সাথে আল্লাহ কিরূপ আচরণ করেছেন?

আবু মুসলিম বললেন, না আমি কী করে জানব, যেদিন আমি ইয়ামান ছেড়ে চলে এসেছি সেদিন থেকে তার আর কোন খবর পাইনি।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন আমি জানি আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের হাতে তাকে হত্যা করিয়েছেন। তার রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছেন

তার অনুসারীদেরকে পুনরায় আল্লাহর দীনে ফিরিয়ে দিয়েছেন

আবু মুসলিম তখন বললেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমার মৃত্যুর পূর্বেই আমার চক্ষু শীতল করেছেন এবং তাকে ধ্বংস করে ধোঁকাপ্রাপ্ত নিরীহ ইয়ামানবাসীকে পূণরায় ইসলামের সুশীতল ছায়ায় ফিরিয়ে দিয়েছেন।

হযরত উমর (রাযি.) তখন বললেন, আমিও ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি. যিনি উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে এমন ব্যক্তিকে দেখার সৌভাগ্য আমাকে দান করেছেন যার সাথে হযরত ইবরাহিম (আ.) এর মত আচরণ করা হয়েছে।

তারপর হযরত উমর (রাযি.) তাঁর হাত ধরে তাঁকে হযরত আবূ বকর (রাযি.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাযি.) কে সালাম দিলেন এবং তাঁর হাতে বায়আত হলেন।

হযরত আবু বকর (রাযি.) তাকে নিজের ও উমরের মাঝে বসালেন...

এবং দুজনেই আসওয়াদ আনাসীর সাথে তাঁর ঘটনা জানতে চাইলেন

* * *

আবু মুসলিম খাওলানী মদীনায় কিছু দিন অবস্থান করলেন। মদীনায় অবস্থান কালে প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর মসজিদে নববীতে কাটত।

যথাসম্ভব বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইলম অর্জন করলেন। যেমন হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, আবু যর গিফারী, উবাদা ইবনে ছমেত, মুয়ায ইবনে জাবাল, আউফ ইবনে মালিক আল-আশজায়ী (রাযি.) প্রমূখ।

এরপর আবু মুসলিমের হৃদয়ে ইচ্ছা জাগল, যে তিনি শামে চলে যাবেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন।

এতে তার উদ্দেশ্য, সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থান করা। যেন রুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারার সওয়াব লাভ করতে পারেন্।

এরপর যখন খিলাফতের দায়িত্ব হযরত মুআবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ানের হাতে অর্পিত হল তখন আবু মুসলিম বেশী বেশী তার কাছে আসা যাওয়া করতেন। তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতেন। হযরত মুআবিয়ার সাথে ছিল তাঁর বিশেষ সর্ম্পক যা তাঁদের দুজনের সুউচ্চ মর্যদার প্রমাণ বহন করে

তাদের অর্পূব চরিত্র মাধুরীর সাক্ষ্য দেয়

এর অসংখ্য ঘটনাবলী ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়

একবারের ঘটনা। আবু মুসলিম হযরত মুআবিয়ার (রাযি.)-এর কাছে গেলেন। দেখলেন, মুআবিয়া (রাযি.) ভরা মজলিসের সদর হয়ে বসে আছেন।

তাঁকে ঘিরে আছে তার রাজ্যের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তার সেনাপতিগণ এবং তাঁর গোত্রের শীর্ষস্থানীয় লোকজন ...

তিনি আরও দেখতে পেলেন যে, লোকজন তাঁকে সম্মান করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। তাই তিনি হযরত মুআবিয়ার ব্যাপারে খুবই শংকিত হয়ে পড়লেন। কাল বিলম্ব না করে তৎক্ষনাৎ বলে ফেললেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَجِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ হে মুমিনদের শ্রমিক! আপনাকে সালাম। আবু মুসলিমের কথা শুনে লোকজন তাঁর দিকে ফিরে তাকাল এবং বলল ঃ হে আবু মুসলিম মুমিনদের শ্রমিক নয় তিনি আমীরুল মুমিনীন।

কিন্তু আবু মুসলিম তাদের কথার কোনই গুরুত্ব দিলেন না। আবার বললেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَجِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

হে মুমিনদের শ্রমিক! আপনাকে সালাম।

আবার লোকজন বলে উঠল ঃ হে আবু মুসলিম। তিনি তো আমীরুল মুমিনীন।

কিন্তু তিনি তাদের কথায় কান দিলেন না। তাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না। আবার বললেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااَجِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

হে মুমিনদের শ্রমিক আপনাকে সালাম।

এবার লোকজন যখন তাকে সংশোধন করে দেবার ইচ্ছা করল তখন হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) তাদের দিকে ফিরে তাকালেন। এবং বললেন ঃ আবু মুসলিমের কথা ছাড়। তিনি যা বলছেন সে সম্পর্কে তিনি ভালভাবেই অবগত আছেনঃ

আবু মুসলিম হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং বললেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর মানুষের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করার পর আপনার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে, একজন শ্রমিক রেখেছে এবং তার বকরী পালের দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করেছে এবং এই শর্তে তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেছে যে সে সুন্দরভাবে এগুলোর তত্ত্বাবধান করবে। স্বাস্থ্য রক্ষা করবে। সেগুলির পশম ও তার দুধ পরিপূর্ণরূপে উৎপাদন করবে। তাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা যদি সে পরিপূর্ণ রূপে পালন করে এবং তার তত্ত্বাবধানে যদি ছোট বকরীটি বড় হয়, শীর্ণকায়টি মোটা হয় ও রুগ্নটা সুস্থ হয়ে ওঠে, তাহলে তাকে তার পারিশ্রমিক দিবে এবং অতিরিক্ত কিছু বেশীও দিতে পারে। আর যদি সুন্দর ভাবে তত্ত্বাবধান না করে। বকরী পাল থেকে উদাসীন থাকে। ফলে দুর্বল বকরীটা মারা যায়। সবলটির স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। পশম ও দুধ যদি কমে যায়। তাহলে সে পারিশ্রমিক দিবে না বরং তার উপর ক্রোদ্ধ হবে এবং তাকে শাস্তি দিবে।

অতএব আপনি সে পথই বেছে নিন, যাতে আপনার কল্যাণ ও পারিশ্রমিক রয়েছে।

হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) এতক্ষণ মাথা নীচু করে ছিলেন, এবার মাথা উঠালেন এবং বললেন ঃ

আল্লাহ আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে ও প্রজাদের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সত্যিই আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রকৃত কল্যাণকামী । এছাড়া আপনার সম্পর্কে আমার আর কিছু জানা নেই।

* * *

একবার আবু মুসলিম খাওলানী দামেস্কের জামে মসজিদে জুমু'আর নামায পড়তে গেলেন ঃ

আমীরুল মুমিনীন হযরত মু'আবিয়া তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি তখনি "নাহরে বারদা" নতুন করে খননের হুকুম দিয়েছেন। যাতে তার পানি স্বছ হয়ে পানোপযোগী হয়। সে সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।

আবু মুসলিম তখন মসজিদ ভরা মানুষের মধ্য থেকে বলে উঠলেন ঃ

হে মুআবিয়া ! আপনি আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করুন। আজ কালের যে কোন মুহূর্তে আপনি মারা যেতে পারেন, মনে রাখবেন তখন আপনার বাড়ী হবে কোন এক অন্ধকার কবর।

আপনি যদি কোন সৎকাজ করে সেখানে যেতে পারেন তাহলে আপনি তার বিনিময় পাবেন।

আর যদি শূণ্য হাতে যান তাহলে আপনি তা একেবারে শূণ্য গ্রহ রূপে পাবেন।

হে মুআবিয়া ! আপনি এ কথা মনে করবেন না যে খেলাফত হল নহর খননের নাম ...

ধন সম্পদ জমা করার নাম ...

খেলাফত তো বলা হয় আমর বিল হককে

ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাকে

এবং মানুষের জন্য তাই করা যাতে আল্লাহ ও তার রাসূল সন্তুষ্ট হন...

হে মুআবিয়া ! নহর ময়লায় আচ্ছাদিত হয়ে যাক তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা তার পরোয়া করি না যদি আমাদের শীর্ষ ব্যক্তির হৃদয় স্বচ্ছ হয়ে যায়। আর আপনি হলেন আমাদের শীর্ষ ব্যক্তি।

অতএব আপনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ হতে চেষ্টা করুন।

হে মুআবিয়া! আপনি যদি একজন মানুষের উপরও অবিচার করেন তাহলে তার উপর আপনার অবিচার আপনার ন্যায় ইনসাফকে ভুলিয়ে দিবে।

অতএব আপনি জুলুম থেকে বেচেঁ থাকুন।

কেননা কিয়ামতের দিন জুলুম আপনার জন্য অন্ধকারে পরিণত হবে।

আবু মুসলিমের কথা শেষ হলে হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) মিম্বার থেকে নেমে আসলেন এবং আবু মুসলিমের দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন ঃ হে আবু মুসলিম আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন এবং আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

* * *

আরেকবারের ঘটনা। হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) মিম্বারে আরোহন করেছেন এবং সবেমাত্র খুৎবা শুরু করেছেন। তখনকার সময়ে হযরত মুআবিয়া দুই মাস যাবৎ মানুষের ভাতা বন্ধ করে রেখেছিলেন।

তাই আবু মুসলিম হযরত মুআবিয়া কে ডেকে বললেন,

হে মু'আবিয়া ! এই ধন-সম্পদ আপনারও নয়, আপনার পিতৃ পুরুষেরও নয়।

তাহলে কোন অধিকারে আপনি মানুষের প্রাপ্য বন্ধ করে রেখেছেন। কেন তাদের প্রাপ্য তাদের প্রদান করছেন না?

আবু মুসলিমের কথায় হযরত মুআবিয়ার চেহারায় ক্রোধের আভাস দেখা দিল। তিনি এখন কি করেন তাই দেখার জন্য সমবেত মুসুল্লীগণ উৎসুক্যের সাথে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু না, তিনি কিছু করলেন না। শুধু ইঙ্গিতে মুসুল্লীদেরকে নিজ নিজ স্থানে বসে থাকার নির্দেশ দিলেন।

তারপর মিম্বার থেকে নেমে পড়লেন এবং উযূ করলেন। তারপর নিজের গায়ে কিছু পানি ছিটিয়ে দিলেন।

তারপর আবার মিম্বারে উঠলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন ঃ

আবু মুসলিম বলেছেন, এ ধন সম্পদ আমারও না আমার পিতৃ পুরুষেরও না

আর আবু মুসলিম যা বলেছেন তা সত্যই বলেছেন ...

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি

রাগ হল শয়তানের পক্ষ থেকে

আর শয়তান হল আগুনের তৈরী

আর পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। অতএব যদি তোমাদের কেউ রাগান্বিত হয় সে যেন গোসল করে নেয়।

হে লোক সকল! আজ বিকালে তোমরা তোমাদের প্রাপ্য নিয়ে যেও। আজ তোমাদের প্রাপ্য আদায় করে দেয়া হবে।

* * *

আল্লাহ তা'আলা আবু মুসলিম খাওলানীকে উত্তম বিনিময় দান করুন। সত্য প্রকাশে তার দৃষ্টান্ত ছিল অনন্য।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মু'আবিয়ার প্রতি সন্তুষ্টি হোন, সত্য গ্রহণে ও হকের সামনে মাথা নত করতে তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য নমুনা।

কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন ঃ

اَقِلُّوْا عَلَيْهِمْ لَا اَبًا لِأَبِيْكُمْ   مِنَ اللَّوْمِ   اَوْ الْمَكَانَ الَّذِيْ سَدُّوْا (سَدُّوْا)

তোমরা তাদের প্রতি তিরষ্কার করো না, যদি পারো তাহলে তাদের শূণ্য স্থান পূরণ কর। এবং তারা যে কাজ সম্পাদন করে গেছেন তা করে দেখাও।

হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)

প্রথম পর্ব

হাদীস বর্ণনায় সালেম ছিলেন নির্ভরযোগ্য। অধিক হাদীস বর্ণনাকারী ও খোদাভীরু একজন মানুষ। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যাঁর সনদ অনেক উঁচু পর্যায়ের।

-ইবনে সাদ

হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)
প্রথম পর্ব

আমরা এখন হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের খেলাফত কালে

ঐ তো আমাদের সামনে মদীনাতুর রাসুল। পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সম্রাট ইয়াজদিগিরদ থেকে মুসলমানগণ যে গনীমতের মাল লাভ করেছে সে গনীমতের মালে মদীনা আজ তরঙ্গায়িত হচ্ছে।

কেননা, সে গনীমতের মালে ছিল মনি-মুক্তা খচিত শাহী মুকুট

স্বর্ণখচিত কোমরবন্দ

ইয়াকুত ও মারজান দ্বারা শোভিত তরবারি। যা অতি আকর্ষনীয়, যা ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি...

অতি মূল্যবান ও মর্যাদাবান যুদ্ধবন্দী যা ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি

কারণ তাদের মধ্যে ছিল স্বয়ং সম্রাট ইয়াজদিগিরদের তিন কণ্যা...

তাই হযরত আলী (রাযি.) অধিক মূল্য দিয়ে সম্রাটের কণ্যাকে কিনে নিলেন এবং তাদের সামনে পেশ করলেন কয়েকজন টগবগে মুসলিম নৌজোয়ান।

তখন তাদের একজন গ্রহণ করে নিল নবী দৌহিত্র হাসান ইবনে আলীকে।

তার ঘরেই জন্ম গ্রহণ করেন যাইনুল আবিদীন ...

দ্বিতীয় জন বেছে নেন হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবী বকরকে

তার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন মদীনার সাত জন ফকীহর অন্যতম কাসেম (রহ.)

আর তৃতীয়জন! তিনি গ্রহণ করলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর কে

তার ঘরেই জন্ম লাভ করেন হযরত উমর (রাযি.) এর দৌহিত্র হযরত সালেম (রহ.)। হযরত উমর (রাযি.) এর আখলাক ও চরিত্রের সাথে যার সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য ছিল

সুতরাং এসো আমরা এই মহান তাবেয়ীর বর্ণাঢ্য জীবনের কিছু আলোকময় চিত্র নিয়ে আলোচনা করি।

* * *

হযরত সালেম (রহ.) জন্ম গ্রহণ করেছেন মদীনার পরিবেশে। যেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করেছেন। যেখানে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেছেন।

তারপর ওহীর আলোয় আলোকিত নবুওয়াতের সুগন্ধিময় পরিবেশে বেড়ে ওঠেছেন ...

আপন পিতার সার্বক্ষণিক তত্বাবধানে লালিত পালিত হয়েছেন। যিনি ছিলেন ইবাদতগুজার দুনিয়াবিমুখ

হযরত উমর (রাযি.) এর গুণে গুণান্বিত হয়েছেন ...

তাঁর পিতা তাঁর মাঝে দেখতে পেয়েছিলেন হেদায়েত ও তাকওয়ার নিদর্শন। তাঁর চলনে বলনে তিনি অবলোকন করেছিলেন ইসলামের কালজয়ী আর্দশ, কুরআনী আখলাক ও অনুপম চরিত্র মাধুরী । যা তার অন্য ভাইদের মধ্যে ছিল না

তাই তিনি হযরত সালেমকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালবাসতেন।

অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত ভালবাসা ও স্নেহ-মমতায় তাকে সিঞ্চিত করতেন। ফলে অনেকেই তাঁকে তিরষ্কার করত। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) তাদের তিরষ্কারের জবাবে বলতেন ঃ

يَلُوْمُوْنَنِىْ فِىْ سَالِمٍ وَأَلُوْمُهُمْ * وَجِلْدَةُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْأَنْفِ سَالِمُ

অর্থাৎ তারা সালেমের ব্যাপারে আমার সমালোচনা করে। এবং আমি তাদের তিরস্কার করি অথচ সালেম হল আমার চোখের পুতলি।

তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে হাদীস ভান্ডার সংগ্রহ করেছেন তা পুত্রের হৃদয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন ।...

তাকে ফকীহ বানাতে লাগলেন

কিতাবুল্লাহর ইলমে তাঁর হৃদয় ভরে দিতে লাগলেন

তারপর তাঁকে মসজিদে নববীতে পাঠিয়ে দিলেন।

* * *

তখনকার দিনে মসজিদে নববী ছিল ইলম ও আমলের এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। সেখানে সাহাবায়ে কেরামের সমাগম হত।

এমন এক পরিবেশে হযরত সালেম বেড়ে উঠতে লাগলেন। যেদিকেই চোখ মেলেন সেদিকেই দেখতে পান একটি আলোকিত মানুষের দল যাদের মাঝে রয়েছে নবুওয়াতের আলোকচ্ছটা এবং রিসালাতের সুগন্ধি।

একারণেই বড় বড় সাহাবী থেকে ইলম অর্জন করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। যাঁদের শীর্ষে ছিলেন হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী, হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আবু রাফে হযরত আবু লুবাবা এবং হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব।

এছাড়া সবার উপরে তো ছিলেন তার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)।

ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি এক বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে আত্ম প্রকাশ করলেন,

তাবেয়ীদের মাঝে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হলেন

মদীনার অন্যতম ফকীহরূপে বিবেচিত হলেন। দ্বীনের ব্যাপারে মানুষ যাদের শরানাপন্ন হত

যাদের কাছ থেকে আপন পালন কর্তার শরীয়ত গ্রহণ করত

দ্বীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মানুষ যাঁদের কাছে হাজির হত।

যাদের অবস্থা এই যে গভর্নরগণ তাদের কাযীদের নির্দেশ দিতেন, যদি কোন বিচার উত্থাপিত হয় তাহলে তা যেন তাঁদর কাছে পেশ করা হয়

তাই যখন তাদের কাছে কোন সমস্যা পেশ করা হত, তারা তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন। আর কাযীগণও তাদের অনুমতি ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত দিতেন না।

* * *

যে সকল গর্ভনর হযরত সালেমের পরামর্শে এবং তাঁর দিকনির্দেশনায় কাজ করতেন তারা ছিলেন বেশী সৌভাগ্যবান। মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি। তারা ছিলেন খলীফার আস্থাভাজন।

পক্ষান্তরে যারা তাঁর পরামর্শের পরিপন্থী কোন কাজ করত মদীনাবাসী তাদের ক্ষেত্রে বেশ সংকীর্নতার পরিচয় দিত এবং তাদের কর্তৃত্ব মেনে নিত না।

এ বিষয়েও নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

একবারের ঘটনা। মদীনার গর্ভনর ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে দহ্হাক। সময়টা ছিল ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিকের খেলাফত কাল।

আব্দুর রহমান জানতে পারলেন, ফাতেমা বিনতে হুসাইনের স্বামী ইন্তে কাল করেছেন। এখন তিনি আপন সন্তানদের কাছে চলে এসেছেন।

তাই আব্দুর রহমান গেলেন তার কাছে এবং নিজের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিলেন।

কিন্তু ফাতেমা সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন, আমি আর বিবাহ করবো না। আমি আমার সন্তানদের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছি।

কিন্তু আব্দুর রহমান নাছোড় বান্দা। তিনি বার বার প্রস্তাব পাঠাতে লাগলেন আর ফাতেমাও তার অনিষ্টতা থেকে বাচাঁর জন্য কোনরূপ কঠোরতা ছাড়াই ওজর আপত্তি পেশ করতে লাগলেন।

আব্দুর রহমান যখন দেখলেন, ফাতেমা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না তখন ভিন্ন পথ ধরলেন। বললেন ঃ

যদি আপনি স্বেচ্ছায় সম্মত না হন তাহলে মদপানের অপবাদ দিয়ে আপনার বড় ছেলেকে বেত্রাঘাত করা হবে।

উপায়ান্তর না দেখে ফাতেমা গেলেন হযরত সালেমের কাছে। সবকিছু জানিয়ে পরামর্শ চাইলেন। হযরত সালেম বললেন আপনি আপনার অভিযোগ লিখে দামেস্কে খলীফার কাছে পাঠান। আপনার উপর যে জোর-জরবদস্তি চালানো হচ্ছে তা জানান। সাথে সাথে নবী-পরিবারের সাথে আপনার নিকটাত্মীয়তার কথাও লিখে পাঠান।

ফাতেমা তাই করলেন। চিঠি লিখে একজন দূতের মাধ্যমে দামেস্কে পাঠিয়ে দিলেন।

* * *

ফাতেমার দূত চিঠি নিয়ে চলে গেছেন। ইতিমধ্যে খলীফা মদীনার বাইতুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত ইবনে হুরমুযকে বাৎসরিক হিসাব পেশ করার জন্য ডেকে পাঠালেন।

তাই তিনি বিদায় নিতে গেলেন ফাতেমা বিনতে হুসাইনের কাছে বললেন ঃ

আমি দামেস্কে যাচ্ছি। খলীফার কাছে আপনার কোন বার্তা আছে কী?

ফাতেমা বললেন ঃ

হ্যাঁ, আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে...

ইবনে দহ্হাক আমার উপর যে জোর- জোবরদস্তি চালাচ্ছে এবং আমার উপর যে চাপ সৃষ্টি করছে সে সংবাদটি খলীফাকে জানাবেন।

সাথে সাথে এও জানাবেন, তিনি মদীনার উলামায়ে কেরামের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রর্দশন করছে না।

বিশেষ করে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর মত মহান তাবেয়ীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু হুরমুয এরজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কেননা গর্ভনরের বিরুদ্ধে খলীফার কাছে ফাতেমার অভিযোগ পেশ করতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। তাই এখন নিজেই নিজেকে তিরষ্কার করতে লাগলেন।

* * *

ইবনে হুরমুয রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং যে দিন ফাতেমার দূত পত্র নিয়ে দামেস্কে পৌছল ইবনে হুরমুযও সেদিন দামেষ্ক পৌছলেন।

ইবনে হুরমুয খলীফার দরবারে উপস্থিত হলে খলীফা মদীনার অবস্থা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বিশেষ করে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ এবং অন্যান্য ফকীহদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ

মদীনার কি বিশেষ কোন সংবাদ আছে যা আমার জানা দরকার?

ইবনে হুরমুয অনেক কথাই বললেন। কিন্তু ফাতেমা বিনতে হুসাইন সম্পর্কে কোন কথা বললেন না এবং সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর ব্যাপারে মদীনার গর্ভনরের বর্তমান অবস্থানের কথাও ব্যক্ত করলেন না।

ঠিক এমন সময় দারোয়ান এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন। মদীনা থেকে ফাতেমা বিনতে হুসাইনের দূত এসেছে দরজায় দাড়িয়ে অনুমতির অপেক্ষায় আছে।

দারোয়ানের কথা শুনেই ইবনে হুরমুযের চেহারা একেবারে পাংশু বর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ

ফাতেমা বিনতে হুসাইন আমার কাছে একটি সংবাদ দিয়েছিলেন। এ বলে খবরটা খলীফাকে জানালেন

ইবনে হুরমুযের কথা শুনেই খলীফা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। সিংহাসন থেকে নেমে পড়লেন এবং বললেন ঃ

ধ্বংস তোমার...

আমি কি তোমাকে মদীনাবাসীর সংবাদ জিজ্ঞেস করিনি?

তোমার কাছে এ ধরনের একটি খবর রয়েছে আর তুমি তা গোপন করে রাখছ?

ইবনে হুরমুয তখন ওজর পেশ করে বললেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম

তারপর খলীফা ফাতেমার দূতকে আসতে বললেন এবং তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে পড়তে লাগলেন। ক্রোধাগ্নি যেন ঠিকরে পড়ছিল তাঁর চোখ থেকে। হাতে রাখা ছড়ি দিয়ে মাটিতে আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন ঃ আব্দুর রহমান নবী পরিবারের প্রতি দুঃসাহস প্রদর্শন করেছে। তাদের প্রতি অবিচার করেছে ...

সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর মত মহান ব্যক্তির নসীহতের পাত্তা দিচ্ছে না!!!

কে আছ যে তাকে মদীনায় কঠোর শাস্তি দিবে আর আমি দামেস্কে বসে তার চিৎকারের আওয়ায শুনব?

তখন একজন বলে উঠলঃ হে আমীরুল মুমীনীন ! আব্দুল ওয়াহেদ নাজারী ব্যতিত মদীনার উপযুক্ত শাসক আর কেউ হতে পারবে না

অতএব আপনি তাকেই মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করুন। সে বর্তমানে তায়েফে অবস্থান করছে ...

খলীফা তখন বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ, সে-ই মদীনার উপযুক্ত

এ বলেই কাগজ কলম আনতে হুকুম করলেন এবং নিজ হাতে লিখতে শুরু করলেন ঃ

আমীরুল মুমিনীন ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে বিশর আন নাজ্জারীর নিকট

আস্‌সালামু আলাইকুম

"আমি তোমাকে মদীনার গর্ভণর নিযুক্ত করলাম। আমার পত্র পেয়েই তুমি মদীনার উদ্দশ্যে রওয়ানা হয়ে যাও। মদীনায় পৌঁছেই প্রথমে ইবনে দহ্‌হাককে বরখাস্ত করবে এবং চল্লিশ হাজার দীনার জরিমানা করবে।

তাকে এমন কঠিন শাস্তি দিবে, যেন দামেস্কে বসে তার চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পাই”

*　　*　　*

দূত খলীফার পত্র নিয়ে তীর বেগে ছুটে চলল মদীনার উদ্দেশ্যে। মদীনা হয়ে সে তায়েফ পৌঁছবে।

কিন্তু মদীনায় পৌঁছে সেখানকার গভর্ণর আব্দুর রহমান ইবনে দহ্হাকের কাছে গেলেন না। তাকে সালামও দিলেন না। ফলে গভর্ণর ইবনে দহ্হাক মনে মনে শংকিত হয়ে পড়ল।

তাই দূতকে তার তাবুতে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে তার আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু দূত কোন কথাই বলল না। তখন গভর্ণর আব্দুর রহমান ইবনে দহ্হাক তার বিছানার পার্শ্ব উঠিয়ে দীনার ভর্তি একটি থলে দেখিয়ে বললেন ঃ

দেখ, এখানে এক হাজার দীনার আছে ...

তুমি যদি তোমার আগমনের উদ্দেশ্য আমার কাছে প্রকাশ কর এবং তোমার কাছে কি বার্তা আছে তা যদি আমাকে জানাও তাহলে আমি ওয়াদা করছি, তোমাকে এই এক হাজার দীনার দিয়ে দিব এবং তোমার ব্যাপারটি গোপন রাখব।

দূত তার কথায় ভিজে গেল । এক হাজার দীনারের লোভে খলীফার নির্দেশের কথা জানিয়ে দিল। আর আব্দুর রহমান ইবনে দহ্হাক তাকে দীনারগুলি দিয়ে বললেন ঃ

তুমি তিন দিন মদীনায় অবস্থান করবে। এর মধ্যে আমি দামেস্কে পৌঁছে যাব। তিন দিন পর তায়েফ গিয়ে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করবে...

*　　*　　*

আব্দুর রহমান ইবনে দহ্হাক দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

দামেস্কে পৌঁছে খলীফার ভাই মাসলামার কাছে গিয়ে উঠলেন। মাসলামা ছিলেন দামেস্কের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। ছিলেন অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারী ...

মাসলামার কাছে গিয়ে বললেন ঃ আমি আপনার আশ্রয়প্রার্থী।

মাসলামা বললেন ঃ তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। এসো, তোমার কী খবর। কী জন্য এসেছ ?

ইবনে দহ্হাক বললেন ঃ আমার একটি পদস্খলনের কারণে আমীরুল মুমিনীন আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন। এখন আপনিই পারেন আমাকে রক্ষা করতে।

তাই মাসলামা খলীফার কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি এক বিশেষ প্রয়োজনে আমীরুল মুমিনীনের কাছে এসেছি।

ইয়াযিদ বললেন ঃ তোমার সকল প্রয়োজনই পুরা করা হবে। তবে ইবনে দহ্হাকের ব্যাপার আলাদা।

মাসলামা বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি তো তার ব্যাপারেই এসেছি...

ইয়াযিদ বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি তাকে ক্ষমা করবো না ...

মাসলামা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার অপরাধ কি ?

আমীরুল মুমিনীন বললেন ঃ সে ফাতেমা বিনতে হুসাইনের প্রতি অন্যায় করেছে। তাঁকে হুমকি দিয়েছে তাঁকে ভয় দেখিয়েছে ...
এমনকি তাঁর ব্যাপারে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর উপদেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি। ফলে মদীনার কবিরা তাকে নিন্দা করছে এবং মদীনার নেককার ও উলামায়ে কেরামগণ তার দোষারোপ করছে ...

মাসলামা তখন বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।

ইয়াযিদ তখন বললেন ঃ

তাকে বল, সে যেন মদীনায় ফিরে যায়। মদীনার নতুন গভর্ণর যাতে যথাযথ ভাবে আমার নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে পারে এবং তাকে যেন পরবর্তী গভর্ণরদের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখে

*   *   *

মদীনাবাসী তাদের নতুন গভর্ণরকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হল। বিশেষ করে ইবনে দহ্হাকের উপর খলীফার নির্দেশ বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে তার দৃঢ়তায় মদীনাবাসী বিমুগ্ধ হল।

তাঁর সাথে মদীনাবাসীর সম্পর্ক আরও গভীর হল যখন তারা দেখতে পেল, তিনি কল্যাণজনক কাজ করছেন এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করছেন না।

তাই ধন্যবাদ মুসলিম খলীফা ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিককে

স্বাগত ঐ ইসলাম ধর্মকে যে ধর্ম এমন অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং এমন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছে।

*   *   *

হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)

দুনিয়ার প্রতি নির্মোহতা, ইজ্জত-সম্মান জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সালেহীনের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন হযরত সালেম। সেকালে তাঁর মত আর কেউ ছিল না।

- ইমাম মালেক (রহ.)

হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)
দ্বিতীয় পর্ব

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের বেশ কয়েকজন পুত্র সন্তান ছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহই ছিলেন পিতার সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরও ছিলেন অনেক পুত্র সন্তানের অধিকারী। তন্মধ্যে হযরত সালেমই ছিলেন তার পিতার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং এসো হে বন্ধুরা! আমরা এই মহান ব্যক্তির জীবনী নিয়ে আলোচনা করি।

* * *

হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) লালিত-পালিত হয়েছেন মদীনার স্নিগ্ধ পরিবেশে ...

তখন মদীনায় ছিল ধন-সম্পদ আরাম-আয়েশের প্রাচুর্য। ইতোপূর্বে মদীনাবাসী যার দৃষ্টান্ত দেখেনি। চতুর্দিক থেকে অপরিমিত খাদ্য সামগ্রী আসত মদীনায়।

বনী উমাইয়ার খলীফাগণ ধন-সম্পদের এমন সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যা কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) পার্থিব জগতের প্রতি ফিরেও তাকাননি। অন্য অনেকেই যেমন দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তিনি তাদের মত হননি। মানুষের হাতের দিকে কখনও ফিরেও তাকাতেন না। পারলৌকিক সফলতার জন্য ইহলৌকিক সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

বনী উমাইয়ার শাসকগণ অন্যান্যদের যেমন প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন তেমনিভাবে সালেমকেও বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু তিনি মানুষের সম্পদের প্রতি ছিলেন নির্মোহ। দুনিয়া ও দুনিয়ার শান-শওকতকে সবসময় দেখতেন ছোট নজরে

একবারের ঘটনা।

খলীফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক মক্কায় হজ্জ করতে আসলেন। তিনি তাওয়াফেকুদুম আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁর নজর পড়ল হযরত সালেমের উপর। কাবার সামনে অত্যন্ত জড়সড় হয়ে বসে আছেন। একান্ত বিনয়-নম্র ও একাগ্রতার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করছেন ...

গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসছে। যেন তা এক 'অশ্রু-সাগর'।

খলীফা তাওয়াফ শেষ করলেন। দু রাকাত নামায আদায় করে সালেমের দিকে অগ্রসর হলেন।

তাকে দেখে লোকজন রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছিল। তিনি গিয়ে হযরত সালেমের পাশে বসলেন। এতো নিকটে বসলেন যে, তাঁর হাঁটু হযরত সালেমের হাঁটুর সাথে প্রায় লেগে গিয়েছিল।

কিন্তু সালেমের সে দিকে কোন খেয়াল নেই। তিনি ফিরেও তাকালেন না, কারণ তিনি তো আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। আল্লাহর যিকরে ডুবে আছেন ...

খলীফা আঁড় চোখে হযরত সালেমের দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। কারণ, তিনি তিলাওয়াত ও কান্না থামালে তার সাথে কথা বলবেন।

একটু পরে যখন তার কাংখিত সুযোগটি এসে গেল তখন তিনি হযরত সালেমের দিকে ঝুঁকে বললেন ঃ

السلام عليك يا اباعمر ورحمةالله

হযরত সালেম জাবাবে বললেন ঃ

وعليك السلام ورحمةالله وبركاته

খলীফা তখন ছোট্ট করে বললেন ঃ

হে আবু উমর! আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন। আমি তা পূরণ করে দিব।

কিন্তু সালেম কোন উত্তর দিলেন না।

খলীফা ভাবলেন, সালেম হয়ত তার কথা শুনেননি। তাই তিনি আরো কাছে গিয়ে বললেন ঃ

আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি আপনার কোন প্রয়োজন পূরা করে দিব।

তখন হযরত সালেম বললেন ঃ

আল্লাহর কসম, আমি বাইতুল্লাহ শরীফে থাকব আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে কিছু চাইব, এটাতো হতে পারে না।

খলীফা একটু লজ্জা পেলেন। কোন কথা বললেন না। সে স্থানেই চুপ করে বসে রইলেন।

নামায শেষ হলে হযরত সালেম ওঠে দাঁড়ালেন এবং তাবুর দিকে যেতে লাগলেন।

তার পিছনে পিছনে একদল মানুষ চলল

তাদের কেউ তাঁকে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে ...

কেউ বা দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন ...

আবার কেউ হয়ত জাগতিক কোন বিষয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইছে...

কেউবা তাঁর কাছে দুআ প্রার্থনা করছে।

হযরত সালেমের পিছনে পিছনে যারা গিয়েছিল খলীফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক ছিলেন তাদের একজন। লোকজন তাঁকে দেখে রাস্তা

প্রশস্ত করে দিল। তিনি একেবারে সালেমের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটতে লাগলেন এবং তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন ঃ

হে আবূ উমর! আমরা তো এখন বাইতুল্লাহর বাহিরে চলে এসেছি।। এখন আমাকে বলুন, আমি আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিব।

সালেম বললেন ঃ

দুনিয়ার কোন প্রয়োজনের কথা বলব, না আখেরাতের?

সালেমের কথায় খলীফা প্রথমে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন ঃ

না আখেরাতের নয়। দুনিয়ার কোন প্রয়োজনের কথাই বলুন ...

হযরত সালেম তখন বললেন ঃ

দুনিয়ার ধন সম্পদের যিনি মালিক আমি তো তাঁর কাছেই দুনিয়া চাই না। সুতরাং যে মালিক নয় তার কাছে কী করে চাইব?

এবারও খলীফা লজ্জা পেলেন, তিনি তখন সালেমকে বিদায় জানিয়ে চলে আসলেন। আসার সময় তিনি বলছিলেন ঃ

দুনিয়ার প্রতি নির্মোহিতা ও আল্লাহর প্রতি ভয় তোমাদেরকে কতই না সম্মানিত করেছে।

কতই না তোমাদেরকে অমুখাপেক্ষী করেছে

তোমাদের উপর আল্লাহ্ বরকত দান করুন।

* * *

এই ঘটনার এক বছর আগের কথা। খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক এসেছেন হজ্জ করতে। লোকজন যখন আরাফা থেকে চলে গেল তখন খলীফা মুযদালিফায় সালেমের সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তখন এহরাম বাধা অবস্থায় ছিলেন। ওয়ালিদ তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। এরপর তিনি হযরত সালেমের শরীরের দিকে

তাকালেন। তখন তাঁর গায়ে কোন কাপড় ছিল না। সালেম ছিলেন সুগঠিত ও সুঠাম দেহের অধিকারী এক শক্তিশালী পুরুষ। তাঁর হৃষ্টপুষ্ট শরীর দেখে খলীফা বললেন ঃ

আপনি তো অত্যন্ত চমৎকার স্বাস্থের অধিকারী।

আপনি কোন খাবার বেশী খান?

সালেম বললেন ঃ

রুটি আর যাইতুন

তবে গোস্ত পেলে তাও খাই।

খলীফা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

শুধু রুটি ও যাইতুন?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে সালেম বললেন, হ্যাঁ...

খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার অন্য কিছু খাওয়ার আগ্রহ নেই?

সালেম বললেনঃ যে পর্যন্ত খাবারের প্রতি আমার আগ্রহ না হয়, আমি খাই না। যখন আমার ক্ষুধা হয় এবং ঐ খাবারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তখনই খাই।

* * *

পার্থিব জগতের প্রতি নির্মোহতা ও দুনিয়ার শান শওকতের নিরাসক্তির ক্ষেত্রে হযরত সালেম যেন তাঁর পিতামহের মত ছিলেন, ঠিক নিঃশংক চিত্তে নির্ভিকভাবে সত্য প্রকাশেও তিনি ছিলেন তাঁর যথার্থ উত্তরাধিকারী। পরিস্থিতি যত ভয়াবহই হোক না কেন এবং পরিনাম যত খারাপই হোক না কেন, সত্য প্রকাশে তিনি কখনও পিছপা হতেন না। এধরনের অসংখ্য কাহিনী ইতিহাসের পাতাকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

একবারের ঘটনা। মুসলমানদের বিভিন্ন প্রয়োজন নিয়ে হযরত সালেম গেলেন হাজ্জাজের কাছে।

হাজ্জাজ তাকে স্বাগত জানালেন এবং খুবই তাযীম তাকরীম করলেন...

দুজনেই বসে আছেন। এমন সময় শৃঙ্খলিত কিছু বন্দীকে হাজ্জাজের সামনে হাজির করা হল। তাদের চুলগুলো উষ্কু খুষ্কু। শরীর ধুলি মলীন, চেহারা একেবারে ফ্যাকাসে।

হাজ্জাজ তখন হযরত সালেমের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

এরা বিদ্রোহী। দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। অনর্থক নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে।

এরপর হাজ্জাজ হযরত সালেমের হাতে তরবারি তুলে দিলেন এবং বন্দীদের প্রথম জনের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ

আপনি তাকে হত্যা করুন ...

হযরত সালেম হাজ্জাজের হাত থেকে তরবারি নিয়ে বন্দীটির দিকে এগিয়ে গেলেন। উপস্থিত লোকজন গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগল তিনি কি করেন?

কিন্তু না তিনি কিছুই করলেন না। বরং লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

তুমি কি মুসলমান?

লোকটি বলল ঃ

হ্যাঁ, আমি মুসলমান ...

কিন্তু আপনি একি জিজ্ঞেস করছেন?

আপনাকে যে হুকুম দেয়া হয়েছে তাই তামীল করুন ..

হযরত সালেম তখন তাকে বললেন ঃ

তুমি কি ফজরের নামায পড়েছে?

বন্দীটি বলল ঃ

আপনাকে আগেই বললাম, আমি মুসলমান এখন আবার জিজ্ঞেস করছেন ফজরের নামায পড়েছি কি না?

হযরত সালেম বললেন ঃ

আমি জিজ্ঞেস করছি ঃ আজকের ফজর পড়েছ কিনা?

লোকটি বলল ঃ

আল্লাহ্ আপনাকে হেদায়েত করুন।

আমি তো বলেছিই আমি নামায পড়েছি ...

এখন আপনার কাছে আমার অনুরোধ, এই জালেম আপনাকে যে হুকুম দিয়েছে তা তামীল করুন, অন্যাথায় আপনি ও তার কোপানলে পড়বেন।

হযরত সালেম তখন হাজ্জাজের কাছে ফিরে গেলেন এবং তার সামনে তরবারি ফেলে দিলেন।

বললেন ঃ

এই লোকটি স্বীকার করছে, সে মুসলমান। আজকের ফজরের নামায ও পড়েছে।

আর আমি জানি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللهِ

যে ফজরের নামায আদায় করল তার নিরাপত্তা আল্লাহর দায়িত্বে।

অতএব স্বয়ং আল্লাহ্ যার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন আমি তাকে কতল করতে পারব না।

হাজ্জাজ তখন ক্রোধের স্বরে বললেন ঃ

ফজরের নামায তরক করার কারণে তো আমরা তাকে হত্যা করছি না...

আমরা তাকে হত্যা করছি একারনে যে, সে হযরত উসমান (রাযি.)-এর হত্যায় সহযোগীতা করেছিল।

সালেম তখন বললেন ঃ

এখনও এমন লোক আছে যারা হযরত উসমান (রাযিঃ) এর হত্যার বদলা নিতে আমার আপনার চেয়ে বেশী হকদার।

সালেমের কথা শুনে হাজ্জাজ একেবারে চুপ হয়ে গেল। কোন জবাব দিতে পারল না

এর কিছু দিন পরে হাজ্জাজের মজলিসে উপস্থিত ছিল এমন এক ব্যক্তি মদীনায় গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে এই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলেন

ঘটনার কিছু অংশ শুনেই হযরত আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারপর সালেম কি করল?

লোকটি বলল,

তিনি তো এই এই করেছেন। অবশ্য হত্যা করেননি। তখন আব্দুল্লাহ অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বললেন ঃ

সে বুদ্ধিমান ... সে বুদ্ধিমান...

সে জ্ঞানী

* * *

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের কাছে যখন খিলাফতের দায়িত্ব এলো তখন তিনি হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর কাছে এ মর্মে পত্র লিখলেন ঃ

"আমার সাথে কোন রূপ পরামর্শ ছাড়াই খেলাফাতের এই গুরুদায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করছেন।

তাই আমি আল্লাহর কাছে দুআ করছি,

তিনি যেন এই দায়িত্ব পালনে আমাকে সহায়তা করেন।

সুতরাং আমার এই পত্র পেয়ে অতিসত্ত্বর আমার জন্য হযরত উমরের কিতাব পত্র, তাঁর "কথা" তাঁর সীরাত পাঠিয়ে দিবেন।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলব

যদি আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন তাহলে আমি তাঁর কর্মপন্থার পূর্ণ অনুকরণ করব...

তখন হযরত সালেম (রহ.) তার উত্তরে লিখলেন ঃ

আপনার পত্র আমি পেয়েছি। আপনি তাতে লিখেছেন, আপনার সাথে কোন রূপ পরামর্শ ছাড়াই আপনাকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

আপনি আরও লিখেছেন, হযরত উমরের কর্মপন্থা আপনি অনুসরণ করতে চান ...

কিন্তু আপনার মনে রাখা উচিৎ, আপনার যামানা আর হযরত উমরের যামানা এক নয় ...

তাছাড়া হযরত উমরের সাথে যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গ ছিলেন আপনার সাথে তাঁরা নেই।

হ্যাঁ আপনি যদি ভাল কাজের নিয়্যত করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আপনার জন্য এমন সহযোগীর ব্যবস্থা করে দিবেন যারা আপনার সাথে নিরলস কাজ করে যাবেন।

তাদেরকে এমন যায়গা থেকে ব্যাবস্থা করে দিবেন যে আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না

কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিয়্যত অনুযায়ীই তাকে সাহায্য করে থাকেন ...

কল্যাণের কাজে যদি তার নিয়্যত পরিপূর্ণ হয় তাহলে সে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর সাহায্যও পাবে।

আর যদি নিয়্যত অসম্পূর্ণরূপে হয় তাহলে আল্লাহর সাহায্যও হবে অসম্পূর্ণ।

আল্লাহর সন্তুষ্টিজনক কাজে যদি আপনার নফস আপনার প্রতিবন্ধক হয় তাহলে আপনি স্মরণ করুন তাদের কথা যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অপরিমিত ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আপনার আগেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে।

নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, কিভাবে তাদের চোখগুলো উপড়ে ফেলা হয়েছে।

কিভাবে তাদের উদরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়েছে ...

কিভাবে এখন তারা পুর্তিগন্ধময় মৃত লাশে পরিণত হয়েছে, যদি তাদেরকে আমাদের ঘরের আশে পাশে রেখে দেয়া হত তাহলে তার দুর্গন্ধে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম।

আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে যেতাম।

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

*　　*　　*

তারপর হযরত সালেম (রহ.) দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। তাঁর জীবন ছিল তাকওয়া ও খোদাভীতিতে পরিপূর্ণ

সত্য ও হেদায়েতে ভরপুর ...

তিনি দুনিয়ার শানশওকত এবং তার চাকচিক্য থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন।

এর মাঝে তিনি সে কাজই করেছেন যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

তাই তিনি শক্ত খাবার খেয়েছেন ...

এবং মোটা কাপড় পড়েছেন ...

এবং একজন সাধারণ সৈন্য হিসাবে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে দিয়েছেন এবং বুকভরা স্নেহ নিয়ে তাদের পাশে দাড়িয়েছেন ...

একশত ছয় হিজরীতে যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন তখন মদীনাবাসী শোকে-দুঃখে মৃহ্যমান হয়ে পড়ল

তার বিচ্ছেদে প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হল ...

এবং প্রতিটি মানুষের চোখ থেকে অশ্রু ঝরলো

তাই সমস্ত মানুষ তার জানাযা ও দাফন কাজে শরীক হয়েছিল

এবং তার জানাযাকে বিদায় জানিয়েছিল।

সেদিন হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক ও তার জানাযায় উপস্থিছিলেন।

এতো মানুষের ভীড় এবং তাদের বেদনা ভারাক্রান্ত চেহারা দেখে তার হৃদয়ে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠল তিনি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন, এই শহরে যদি স্বয়ং খলীফাতুল মুসলিমীন আজ ইন্তেকাল করতেন তাহলে কি তার জানাযায় এতো মানুষের সমাগম হত?

এরপর তিনি মদীনার গভর্ণর ইবরাহীম ইবনে হিশাম মাখজুমীকে বললেনঃ মদীনাবাসীর জন্য নির্ধারণ করে দাও যেন তারা চার হাজার লোককে সীমান্তে পাঠায় তখন থেকে সে বছরের নাম হল "চার হাজারের বৎসর"

আল্লাহ তায়ালা হযরত সালেমের কবরকে সজীব রাখুন এবং তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন।

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.)
প্রথম পর্ব

সুউচ্চ মনোবল এবং সুমহান লক্ষ্যের ক্ষেত্রে আব্দুর রহমান গাফেকী ছিলেন মুসা বিন নুসাইর ও তারেক বিন যিয়াদের যোগ্য উত্তরসূরী।

-ঐতিহাসিকগণ

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.)
প্রথম পর্ব

পঞ্চম খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাদের কাউকে কাউকে বরখাস্ত করে তার স্থানে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করতে লাগলেন।

তিনি নতুন ভাবে যাদেরকে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সামহুবনু মালিক আল খাওলানী।

আমীরুল মুমিনীন তার হাতে আন্দালুস এবং তার পার্শ্ববর্তী বিজিত অঞ্চলসমূহের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

* * *

নতুন গভর্নর চলে গেলেন আন্দালুসে। সেখানে তিনি তাদেরকে খুঁজতে লাগলেন যারা সত্য ও কল্যালের সহযোগী। তাই তিনি তার সভাসদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

এ অঞ্চলে কি এখনও কোন তাবেয়ী আছেন?

তারা বললেন, হ্যাঁ

হে সম্মানিত আমীর! আমাদের মধ্যে এখনও একজন তাবেয়ী আছেন। তিনি হলেন, হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী। এরপর লোকজন তাঁর কিতাবুল্লাহর ইলম হাদীসের বুঝ, জিহাদের ময়দানে তাঁর দুঃস্বাহসিক ভূমিকা ও শাহাদাতের প্রতি প্রবল আগ্রহের বিবরণ দিল।

সাথে সাথে পার্থিব জগতের প্রতি তাঁর নির্মোহতার ও বিস্তারিত বর্ণনা দিল।

তারপর বলল ঃ

তিনি মহান সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাক্ষাত লাভ করেছেন।

এবং পূর্ণরূপে তাঁর আদর্শের অনুসরণ করেছেন।

* * *

সাম্‌হ্ ইবনে মালিক তাঁর কথা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং তাঁকে ডেকে পাঠালেন। হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী যখন আসলেন তখন তিনি তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা দিলেন এবং তাঁকে কাছে বসালেন। এরপর তাঁর সাথে বসে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন

অনেক কঠিন ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন ...

তার শক্তি সামর্থ জানার জন্য বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন

তাঁর সাথে আলোচনা করে তিনি দেখলেন, তার সম্পর্কে তিনি যা জেনেছেন তাঁর চেয়েও তিনি অনেক উর্ধ্বে। তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

তাই সাম্‌হ ইবনে মালিক তাকে আন্দালুসের কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের সবিনয় অনুরোধ করলেন।

কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী সবিনয়ে তার কথা প্রত্যাক্ষ্যাণ করে বললেন ঃ হে সম্মানিত আমীর ! আমি তো একজন সাধারণ মানুষ।

মুসলমানদের সীমান্ত পাহারা দিতে এ রাজ্যে এসেছি ...

এবং আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবনকে "ওয়াকফ" করে দিয়েছি...

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য তরবারী ধারণ করেছি ...

আপনি যতদিন পর্যন্ত হকের উপর থাকবেন ততদিন আমি ইনশাআল্লাহ আপনার সাথে থাকব।

যতদিন আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবেন ততদিন আমিও আপনার অনুগত হয়ে থাকব

তবে কোনরূপ নেতৃত্ব বা দায়িত্বের প্রয়োজন নেই।

* * *

সাম্হ ইবনে মালিক গভর্নর হবার পর বেশী দিন যায়নি। ইতিমধ্যেই গোটা ফ্রান্স দখল করে তা ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন।

কেননা ফ্রান্স বিজিত হলে বিশাল ফ্রান্সের পথ ধরে বলকান পৌঁছা যাবে

তারপর বলকান হয়ে কনস্ট্যান্টিনিওপল দখল করা যাবে

তাহলেই বাস্তবায়িত হবে কনস্ট্যান্টিনিওপল সম্পর্কে নবীজীর ভবিষ্যত বাণী।

কিন্তু তার এই প্রথম পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের মুখে বাধা হল নারবোনী শহর। একমাত্র নারবোনী শহরের উপরই নির্ভর করে এই লক্ষ্য অর্জন।

কেননা নারবোনী শহর ছিল আন্দালুসের পার্শ্ববর্তী ফ্রান্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর।

যখনই তারা বিরনিয়া" পাহাড় থেকে অবতরণ করতেন তখনই তাদের সামনে অলংঘনীয় পাহাড়ের মত বাধা হয়ে দাঁড়াত এই শহর

তাছাড়া এই শহরটি ছিল ফ্রান্স বিজয়ের সব চেয়ে বড় পথ

এবং ফ্রান্স বিজয়াগ্রহীদের একমাত্র কেন্দ্র বিন্দু।

* * *

সাম্হ ইবনে মালিক নারবোনী শহর অবরোধ করলেন এবং নারবোনী বাসীকে জানিয়ে দিলেন, হয় ইসলাম গ্রহণ কর, নয়তো বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া প্রদান কর। কিন্তু তারা এটাকে তাদের জন্য বিরাট কঠিন ব্যাপার মনে করল এবং তা অস্বীকার করল।

তাই তিনি তাদের উপর আক্রমণ করলেন এবং মিনজানিক দিয়ে তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। মুজাহিদ বাহিনীর আক্রমন

এত প্রচন্ড ছিল যে, ইউরোপের অধিবাসীরা ইতিপূর্বে এর নযীর দেখেনি। এভাবে দীর্ঘ আটাশ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ অবরোধ ও তীব্র আক্রমণের ফলে সুরক্ষিত এই দুর্গটির পতন হয়।

এরপর বিজয়ী সেনাপতি সাম্‌হ ইবনে মালিক তার বিশাল বাহিনী নিয়ে "টুলুস" শহরের অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। টুলস ছিল "উকতানিয়া" প্রদেশের রাজধানী।

শহর অবরোধ করলেন এবং চতুর্দিকে মিনজানিক স্থাপন করলেন।

এমন সব যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করলেন যে, ইউরোপের অধিবাসীরা ইতিপূর্বে যার কোন নযীর দেখেনি

ফলে সুরক্ষিত এই শহরটিও পতনের উপক্রম হল। ঠিক এমন সময় এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল যার কল্পনাও কেউ করতে পারেনি।

তাই সেই মর্মান্তিক ঘটনাটিই আমরা শুনব বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ রেনু এর কাছে।

প্রাচ্যবিদ রেনু বলেন ঃ

বিজয় যখন মুসলিম বাহিনীর প্রায় হাতের লাগালে ঠিক তখন উকতানিয়ার "ডিউক"এবং জনগন দেশ রক্ষার জন্য মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের কাছে সাহায্য চাইল।

সমগ্র ইউরোপে দূত পাঠিয়ে দিলে তারা গোটা ইউরোপ চষে বেড়াল।

এবং বিভিন্ন শাসনকর্তা ও গভর্নরদের সতর্ক করে দিলে যে, মুসলিম বাহিনী যদি তাদের রাজ্য দখল করে নেয় তাহলে তাদের স্ত্রীদের এবং তাদের সন্তানদেরকে গোলাম বাদীতে পরিণত করবে।

তাদের প্রচারণা এবং সতর্কবাণীর ফলে ইউরোপের কোন একজন নাগরিকও যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে রইলনা। সকলেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল।

ফলে তাদের সেনাবাহিনী এতো বিশাল হল যে, পৃথিবী ইতোপূর্বে তার কোন নযীর দেখেনি।

এমনকি তারা যে দিকেই যাচ্ছিল সেদিকেই এতো পরিমান ধুলি উড়ছিল যে সূর্য পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না।

এক সময় দুই বাহিনী আবার মুখোমুখি হল।

এই দুই বিশাল বাহিনী দেখে মানুষের মনে হচ্ছিল যেন পাহাড়ের সাথে পাহাড়ের সংঘর্ষ হতে যাচ্ছে। এরপর দুই বাহিনীর মধ্যে এমন ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হল। ইতিহাস ইতিপূর্বে যার কোন নযীর পেশ করতে পারেনি।

সেনাপ্রধান সাম্‌হ ইবনে মালিক চতুর্দিক থেকেই আমাদের বাহিনীর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন।

চতুর্দিক থেকে তার সেনাবাহিনী সামনে থেকে আক্রমণ করছিলেন।

ঠিক এমন সময় একটি তীর এসে বিধল তাঁর গায়ে। আর সাথে সাথেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

মুসলিম বাহিনী যখন তাদের সেনাপতিকে পড়ে যেতে দেখল তখন সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে গেল। তারা সাহস হারিয়ে ফেলল এবং দূর্বল হয়ে পড়ল। তাদের সারি বিচ্ছিন্ন হতে লাগল।

তখন ইউরোপের যোদ্ধারা গোটা মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করে দেবার মত উৎসাহ পেল।

যদি আল্লাহ তা'আলা এক মহান সেনাপতির মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগীতা না করতেন ইউরোপবাসী যাকে আব্দুর রহমান গাফেকী নামে চিনে তাহলে আমাদের সেনাবাহিনী তাদেরকে সমূলে নিশ্চিন্হ করে দিত।

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে নিয়ে স্পেনে ফিরে আসলেন।

কিন্তু তিনি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করলেন, আবার তিনি তাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ করবেন।

*　　*　　*

মেঘের আবরণ ভেদ করে পুর্ণিমার চাঁদ যেমন আকাশে ভেসে ওঠে
এবং দিকভ্রান্ত পথিক তার আলোতে পথ খুঁজে পায়
ঠিক তেমনিভাবে 'টুলুস' রণাঙ্গনের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আব্দুর রহমান গাফেকীর বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্য প্রকাশ পেল।

মরুভূমির তপ্ত বালুতে মৃত্যু মুখে পতিত পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি দেখলে যেমন সেদিকে হাত বাড়িয়ে দেয়

ঠিক তেমনিভাবে মুসলিম বাহিনীও আব্দুর রহমান গাফেকীকে পেয়ে তার দিকে আনুগত্যের হাত বাড়িয়ে দিল।

তার হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল

আর এতে আশ্চর্যেরও কিছু নেই। কেননা ইউরোপে আসার পর মুসলিম বাহিনী সর্ব প্রথম 'টুলুস' রণাঙ্গনেই এই মহা বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয়েছে।

এটাই ছিল তাদের সব চেয়ে গভীর ক্ষত।
আর আব্দুর রহমান গাফেকীই ছিলেন তাদের এই ক্ষতের জন্য 'মলম' স্বরূপ।
তিনি বুক ভরা স্নেহ ও হৃদয় ভরা মমতা নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং তাদের তত্ত্বাবধান ও দেখা-শোনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

* * *

ফ্রান্সে মুসলিম বাহিনীর এই বিপর্যয়ের বেদনাদায়ক সংবাদ দামেস্কের খিলাফতের হৃৎপিণ্ডে প্রচন্ড আঘাত হানল।

মহান সেনাপতি সাম্হ ইবনে মালিকের শাহাদত তার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিল।
তাই কাল বিলম্ব না করে সমগ্র স্পেনসহ আশপাশের বিজিত সকল এলাকার দায়িত্ব আব্দুর রহমান গাফেকীর হাতে অর্পণ করল।
এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিল।

আর এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। কেননা গাফেকী যেমন ছিলেন বিচক্ষণ, তেমনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান। যেমন ছিল তাঁর ইখলাস ও তাকওয়া তেমনি ছিল তাঁর দূরদর্শীতা ও অগ্রগণ্যতা।

* * *

আব্দুর রহমান গাফেকী স্পেনের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রথমেই সেনাবাহিনীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে মনযোগী হলেন।

তাদের শক্তি সাহস তাদের আত্মমর্যাদার অনুভূতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু করলেন।

মুসা বিন নুসাইর থেকে শুরু করে সাম্‌হ ইবনে মালিক পর্যন্ত যে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংগ্রাম চলে আসছিল তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগলেন।

কেননা এ সকল মহান সেনানায়কদের লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স থেকে ইটালি পৌঁছার

তারপর জার্মান, তারপর ইটালী ও জার্মানের পথ ধরে কন্সট্যান্টিনোপল পর্যন্ত ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়া।

ভূমধ্য সাগরকে একটি ইসলামী সাগরে পরিণত করা।

রোম সাগরের পরিবর্তে তার নাম করা 'বাহরে শাম' তথা শাম সাগর...

* * *

আব্দুর রহমান গাফেকীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আত্মসংশোধন এবং হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত চূড়ান্ত লড়াইয়ে বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে ইসলাহে নফস বা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে।

তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে, দূর্গ যদি ভিতর থেকে সুরক্ষিত না হয় তাহলে শত্রুর হাত থেকে কখনও বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব নয়

আর মুমিনের নফস বা আত্মাই হল সেই দূর্গ

তাই সমগ্র আন্দালুসের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। এক এক করে প্রতিটি শহরে যেতে লাগলেন।

এবং ঘোষকদেরকে মানুষের মাঝে এই মর্মে ঘোষণা করার নির্দেশ দিলেন যে,

কোন ব্যক্তি যদি কোন গভর্নরের কাছে কিংবা কোন কাযীর কাছে ...

অথবা অন্য কোন সাধারণ মানুষের কাছে জুলুমের শিকার হয়ে থাকে তাহলে সে যেন তা আমীরের কাছে উত্থাপন করে।

এক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এরপর তিনি এক এক করে প্রত্যেকের অভিযোগ অনুযোগের কথা মনযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন।

দুর্বলের পক্ষ হয়ে শক্তিশালীর কাছ থেকে কিছাছ নিতে লাগলেন।

জালেম থেকে মাজলুমের হক আদায় করে দিলেন।

তারপর তিনি প্রত্যেক রাজকর্মচারীর দিকে নজর দিলেন।

যার থেকে খিয়ানত ও শরীয়ত পরিপন্থি কোন কাজ প্রমাণিত হল তাকে বরখাস্ত করলেন

এবং তার স্থানে এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলেন যার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যার সততা ও সত্যবাদিতার ব্যাপারে তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

যখনই তিনি কোন শহর পরিদর্শনে যেতেন তখন সে শহরের সমস্ত মানুষকে নামাযের সময় সমবেত হবার নির্দেশ দিতেন।

নামাযের পরে তাদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতেন

শাহাদাতের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করতেন

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর বিনিময়ের জন্য তাদেরকে আশান্বিত করতেন।

*　*　*

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী নিজের কথাকে কাজে পরিণত করতেন এবং মানুষকে যে আশায় আশান্বিত করতেন বাস্তবে তা রূপায়িত করতেন।

তাই গভর্নর হবার পর থেকেই অস্ত্র-শস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় রসদ সামগ্রীর ব্যবস্থা তিনি করলেন।

পাহাড়ের চূড়ায় সেনাক্যাম্প নির্মাণসহ বিভিন্ন যায়গায় দূর্গ নির্মাণ করতে লাগলেন।

সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের চলাফেরার জন্য সেতু বানালেন।

তিনি সব চেয়ে বড় যে সেতুটি নির্মাণ করেছিলেন তা আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভার সেতু।

সাধারণ মানুষ এবং সেনাবাহিনীর পারাপারের জন্য কর্ডোভা নদীর উপর এই সেতুটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন।

দেশ ও দেশবাসীকে ধ্বংসাত্মক বন্যা থেকে রক্ষা করার জন্য এই সেতুটির বিরাট প্রয়োজন ছিল।

এই সেতুটিকে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য বস্তুর অন্যতম মনে করা হয়।

কেননা এর দৈর্ঘ ছিল ষোলশত গজ

উচ্চতা ছিল একশত বিশ গজ

এবং তার প্রস্থ ছিল চল্লিশ গজ

স্পেনের গৌরব হিসাবে আজও এই সেতুটি বিদ্যমান রয়েছে।

* * *

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকীর অভ্যাস ছিল তিনি যে শহরেই যেতেন সেখানকার সেনাপ্রধান এবং বিশিষ্টজনদের এক যায়গায় সমবেত করতেন...

তাদের সব কথা গভীর মনযোগের সাথে শুনতেন ...

তাদের সকল অভিযোগ লিখে রাখতেন

তাদের উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা উপকৃত করার চেষ্টা করতেন।

এসব মজলিসে তিনি নিজে কম কথা বলতেন। তাদের কথা বেশী শুনতেন।

শুধু মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথেই তিনি বসতেন তা নয়।

বরং যিম্মীদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথেও তিনি মিলিত হতেন।

তাদের রাজ্যের বিভিন্ন গোপন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন।

* * *

একবারের ঘটনা।

ফ্রান্সের এক শীর্ষস্থানীয যিম্মীকে ডেকে পাঠালেন এবং তার সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ

আচ্ছা, তোমাদের রাজ্যপ্রধান শার্ল কেন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন না?

এবং অন্যন্য প্রদেশের গভর্ণরদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন না ?

লোকটি তখন বলল ঃ হে আমীর! আপনারা আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন সে ওয়াদা আপনারা যথাযথ পালন করেছেন। তাই আমাদের কর্তব্য হবে আপনার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেয়া এবং সত্য কথা বলা

সম্মানিত আমীর! আপনাদের মহান সেনাপ্রধান সম্পূর্ণ স্পেন দখল করে নিলেন। তারপর আমাদের রাজ্য ও স্পেনের মধ্যবর্তী যে পাহাড়টি রয়েছে সেই বিরনিয়া পাহাড়েরের অভিমুখী হলেন।

ফলে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর এবং পাদ্রীরা আমাদের মহামান্য রাজার কাছে আশ্রয় নিল এবং তাকে বলল ঃ

এই যে অপমান ও লাঞ্ছনা আমাদের ঘাড়ে ও আমাদের সন্তানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাতো যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে।

আমরা তো মুসলমানদের সম্পর্কে অনেক কথাই শুনে আসছিলাম

এবং পূর্ব দিক থেকে তাদের আক্রমণের আশংকায় শংকিত ছিলাম

কিন্তু এখন দেখছি তারা আমাদের মাথার উপর।

এখন দেখছি তারা পশ্চিম দিক থেকে এসে গোটা স্পেনে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। স্পেনের সমস্ত ধন-সম্পদ তারা দখল করে নিয়েছে এখন তারা আমাদের রাজ্যের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় ওঠে এসেছে।

অথচ তাদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য

তাদের অস্ত্র-শস্ত্র একেবারে প্রাচীন

তরবারির আঘাত থেকে বাঁচার জন্য তাদের অধিকাংশেরই কোন বর্ম নেই ...

রণাঙ্গনে ব্যবহারের মত কোন উট ঘোড়াও নেই।

তাহলে তারা কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করল ?

বাদশাহ তখন বললেন ঃ

তোমাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি।

গভীরভাবে তোমাদের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছি।

দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর আমি যা বুঝতে পেরেছি তা হল, এখন তাদের প্রতিরোধ না করাই উচিৎ।

কেননা তারা এখন বাধভাঙ্গা বন্যার মত ধেয়ে আসছে। কোন বাধাই তাদেরকে থামাতে পারবে না। তৃণের মত সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নিয়ে ফেলবে।

তাদেরকে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে বুঝেছি, তাদের মাঝে এমন সদৃঢ় বিশ্বাস এবং এমন সৎসাহস রয়েছে যার কারণে সৈন্যাধিক্য এবং প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রের কোন প্রয়োজন পড়বে না।

তাদের ঈমান ও সততাই তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও উট-ঘোড়ার স্থলাভিষিক্ত।

অতএব তাদের মুকাবিলা করে লাভ নেই। এখন তাদের সুযোগ দাও। যখন তারা অফুরন্ত গণীমতের মাল লাভ করবে

নিজেদের জন্য প্রাসাদ-অট্টালিকা দখল করে নিবে

তাদের গোলাম বাদীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

নেতৃত্বের জন্য পরস্পর প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হবে

তখন তোমরা অতি সহজেই তাদের উপর জয় লাভ করতে পারবে।

তার কথা শুনে আব্দুর রহমান অত্যন্ত দুঃখিত হলেন ও মাথা নীচু করলেন। এরপর মজলিস থেকে ওঠে গেলেন এবং বললেন ঃ

'হাইয়্যা আলাস সালাহ' এসো, নামাযের দিকে এসো। নামাযের সময় হয়ে গেছে।

* * *

চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য আব্দুর রহমান গাফেকী পূর্ণ দুই বৎসর পর্যন্ত প্রস্তুতি নিলেন

বিশাল এক সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন ...

তাদের হিম্মত ও মনোবল চাঙ্গা করলেন । তাদের হৃদয় পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা করলেন

তারপর আফ্রিকার আমীরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। আফ্রিকার আমীরও একদল দুর্ধর্ষ সেনা পাঠিয়ে দিলেন। যাদের বুকে জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল জিহাদের আগুন ...

শাহাদাতের প্রতি ছিল যাদের যারপর-নাই আগ্রহ ...

এদিকে সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর উসমান ইবনে আবি নুসআকে এই মর্মে বার্তা পাঠালেন যে, তিনি যেন তার আসা পর্যন্ত শত্রু বাহিনীর উপর গুপ্ত হামলা চালিয়ে তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখেন।

কিন্তু উসমান ছিল ভিন্ন রকমের মানুষ। যে সব আমীরের ছিল সুউচ্চ মনোবল, যারা এমন কাজের পদক্ষেপ নিতেন যা মানুষের মাঝে তাদের সুখ্যাতি বাড়িয়ে দিত- তাদের প্রতি ছিল তার ঘৃণা।

তাছাড়া ইতিপূর্বে ফ্রান্সের উপর এক আক্রমণে সফল হয়েছিলেন এবং উকতানিয়ার ডিউকের কণ্যাকে নিয়ে এসেছিলেন। তার নাম ছিল মিলীন।

সে ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী মেয়ে।

অপরিমিত সৌন্দর্যের সাথে সাথে তার ছিল 'রাজকণ্যাদের' আত্মগরিমা।

ফলে ভালবাসা দিয়ে সে উসমানের উপর জয় লাভ করল। আর উসমানও আটকা পড়ে তাকে বিয়ে করে নিল। সে উসমানের এমন ভালবাসা আদর যত্ন লাভ করল যা সাধারণত কোন স্ত্রী স্বামীর কাছে পায় না।

ডিউকের কণ্যা কিন্তু এই সুযোগ হাতছাড়া করল না। সে উসমানকে তার পিতার সাথে সন্ধি করার জন্য প্ররোচনা দিতে লাগল। উসমানও তার প্রস্তাবে সম্মত হল এবং এই মর্মে একটি চুক্তি সম্পাদন করল যে, মুসলিম বাহিনী তার প্রদেশে আক্রমণ করবে না।

ঠিক এমন সময় তার শ্বশুরের রাজ্যে আক্রমণ করার জন্য আব্দুর রহমান গাফেকীর নির্দেশ তার কাছে এসে পৌঁছল। আব্দুর রহমান গাফেকীর এই নির্দেশে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল

একেবারে কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হয়ে গেল। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

কিন্তু সে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করল না। অবিলম্বে গাফেকীর কাছে পত্র লিখল তার নির্দেশের ব্যাপারে তাকে ভেবে দেখার অনুরোধ করল এবং নিজের অপারগাতার কথা প্রকাশ করে বলল ঃ

নির্ধারিত সময়ের পুর্বে উকতানিয়ার ডিউকের সাথে কৃত সন্ধিচুক্তি তিনি অমান্য করতে পারবেন না।

তার পত্র পেয়ে আব্দুর রহমান গাফেকী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন...

পূণরায় তিনি দূত প্রেরণ করে বললেন ঃ

তোমার আমীরের নির্দেশ ছাড়া তুমি যে চুক্তি সম্পাদন করেছ তা মান্য করা তোমার জন্য জরুরী নয় এবং মুজাহিদ বাহিনীর জন্য তা মানাও আবশ্যকীয় নয়।

বরং তোমাকে আমি যে নির্দেশ দিয়েছি কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই তা মানা তোমার জন্য জরুরী

উসমান ইবনে নুসআ যখন আব্দুর রহমান গাফেকীকে তার সিদ্ধান্ত থেকে বিন্দু মাত্র টলাতে পারলেন না, তখন তিনি তার শ্বশুরের কাছে দূত

পাঠিয়ে সব খবর জানিয়ে দিলেন এবং তাকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে বললেন।

*　　*　　*

কিন্তু আব্দুর রহমান গাফেকীর গোয়েন্দা বাহিনী উসমানের গতি বিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। ফলে শত্রুর সাথে তার আঁতাতের খবর সহজেই তারা জেনে গেল এবং গাফেকীর কাছে সে সংবাদ পৌঁছে দিল।

তখন আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) কাল বিলম্ব না করে একদল দক্ষ সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন।

একজন অভিজ্ঞ কমান্ডারের হাতে ঝান্ডা দিয়ে তাকে নির্দেশ দিলেন, যে করেই হোক উসমানকে জীবিত অথবা মৃত গ্রেফতার করে নিয়ে আসতে হবে।

*　　*　　*

চৌকষ এই সেনা দলটি উসমান ইবনে আবী নুসআর সেনা ছাউনীতে অতর্কিত হামলা করে বসল এবং তাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে টের পেয়ে গেলো তাই জীবন সঙ্গিনী মিলীন ও অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে পাহাড়ে পালিয়ে গেল।

মুজাহিদ বাহিনীও তার পিছু নিল এবং পাহাড় ঘেরাও করল।

সিংহ যেমন নিজের বাচ্চাকে রক্ষা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ঠিক উসমানও নিজেকে এবং নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠল এবং জানবাজী রেখে মুজাহিদ বাহিনীকে প্রতিহত করতে লাগল

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুজাহিদদের আক্রমণে সে নিহত হল।

তার গায়ে ছিল তরবারির অগণিত আঘাত এবং বর্শার অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন।

মুজাহিদ বাহিনী তার মাথা কেটে তার স্ত্রীসহ আব্দুর রহমান গাফেকীর কাছে নিয়ে এল।

আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) মিলীনের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি অবনত করলেন।

তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন

তারপর তাকে হাদিয়া স্বরূপ দামেস্কের খলীফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

শুরু হল উমাইয়া খলীফার হেরেমে ফ্রান্সের সুন্দরী রাজকণ্যার নতুন জীবন।

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.)
দ্বিতীয় পর্ব

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.)
দ্বিতীয় পর্ব

আন্দালুস বিজিত হবার পর যেসব মুসলমান ইউরোপে যুদ্ধরত ছিল, তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইংরেজ কবি বলেন ঃ

'তাদের সংখ্যা ছিল অগণিত
তারা এসেছিল আরব থেকে এবং বারবার থেকে
রূম ও খাওয়ারিজ থেকে
এসেছিল পারস্য থেকে মিসর থেকে
তাতার থেকে
তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে
সমবেত হয়েছিল একই পতাকা তলে
একই পতাকা তলে তাদেরকে সমবেত করেছিল
তাদের সুদৃঢ় ঈমান, টগবগে যৌবন ...
হৃদয়ের মাঝে প্রজ্বলিত আত্মমর্যাদাবোধ
সীমাহীন ভ্রাতৃত্ববোধ
যা মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করে না।

*   *   *

বিজয়ের নেশায় বিভোর থাকা সত্ত্বেও তাদের সেনাপতিদের আত্মবিশ্বাস কোন অংশেই কম ছিল না

তারা তাদের দূর্বার-দূর্জয় শক্তি নিয়ে গর্বিত ছিল

তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল যে কোনরূপ ক্লান্তি ও অবসাদ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না

প্রথমে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল চিরদিনই তা উজ্জ্বল যৌবনময় থাকবে

তারা আরও বিশ্বাস করেছিল যেদিকেই তারা যাবে বিজয় ও সাহায্য তাদের সাথে সাথে থাকবে

তাদের সেনাবাহিনী সর্বদা সম্মুখপানেই অগ্রসর হতে থাকবে

যতক্ষণ না প্রাচ্যের মত পাশ্চাত্যও তাদের পদানত হয়

যতক্ষণ না তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে আল্লাহর সমিপে মাথা না ঝুকায়

যেন হাজীগণ পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত থেকে আরবের মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে উপস্থিত হতে পারে ...

গিয়ে দাঁড়াতে পারে মক্কায় শক্ত পাথরের উপর ...

* * *

হে ইংরেজ কবি! মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে তুমি যা বলেছ তা ঠিকই বলেছ। বাস্তবতা থেকে তুমি দূরে নও এবং তুমি তোমার অধিকাংশ কথায় কল্পনার ভেলায়ও ভেসে বেড়াচ্ছ না।

সত্যিই এই বিশাল বাহিনী যাদের নেতৃত্বে ছিল মুজাহিদগণ, তারা তোমাদের পিতৃ পুরুষকে অজ্ঞতার জমাট বাধা অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য ছুটে এসেছিলেন

তাদের মধ্যে ছিল আরবের অধিবাসী, আল্লাহর প্রতি যাদের সুদৃঢ় ঈমান ছিল...

তারা এসেছিল শাম থেকে

হেজায থেকে

নজদ থেকে

ইয়ামান থেকে

এবং জাযিরাতুল আরবের সব জায়গা থেকে।

প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ূর মত তারা ছুটে এসেছিল তোমাদের কাছে

তাদের মধ্যে ছিল আফ্রিকার 'বারবার' অঞ্চলের লোক যারা বাধভাঙ্গা বন্যার মত সেই পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল।

তাদের মধ্যে আরও ছিল পারস্যের অধিবাসী। পারস্য সম্রাটদের মূর্তি পূজার প্রতি যাদের বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। ফলে তারা ফিরে এসেছে দ্বীনে তাওহীদের দিকে

প্রশংসনীয় মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর পথে ...

ঠিকই বলেছ তুমি তাদের মধ্যে ছিল রোমের অধিবাসী

কিন্তু তারা বিভিন্ন রকম জুলুম অত্যাচার ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসমানী নূরের দিকে ছুটে এসেছে ...

সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে ...

তাদের মধ্যে ছিল মিসরীয় কিবতিরা - যারা রোমের রাজা বাদশাহদের গোলামীর জিঞ্জির ছুড়ে ফেলেছিল ...

উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের ছায়াতলে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা ...

মোটকথা আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) ও তার পূর্ববর্তী মহান সেনাপতিগণ যে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে যেমন ছিল শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, তেমনি ছিল আরব ও অনারব।

কিন্তু তারা সকলেই ইসলামের আলোয় আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে তারা আল্লাহর অনুগ্রহে ভাইয়ে ভাইয়ে পরিণত হয়েছিল।

হে ইংরেজ কবি! তুমি ঠিকই বলেছ। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের ন্যায় পাশ্চাত্যকেও আল্লাহর দীনের অন্তর্ভূক্ত করা।

মানুষ যেন একমাত্র তাদের রবের কাছেই মাথা নত করে সেই ব্যবস্থা করা।

ইসলামের নূর যেন তোমাদের অঞ্চলের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের আলোকোজ্জ্বল সূর্য যেন তোমাদের প্রতিটি ঘরকে আলোকিত করে

তোমাদের রাজা বাদশাহ ও সাধারণ মানুষ যেন ইসলামের ন্যায়-ইনসাফ সমান ভাবে ভোগ করে।

তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল জীবনের বিনিময়ে হলেও তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে হেদায়েত করা

জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেদের জীবন বাজি রাখা...

*　　*　　*

তারপর

এখন আমি এই মহান বাহিনীর সর্বশেষ ঘটনাটি তোমাদের কাছে পেশ করব। এই বাহিনীর অনন্য নায়ক আব্দুর রহমান গাফেকীর কথা শুনাব।

উকতানিয়ার 'ডিউকের' কাছে যখন তার জামাতা উসমান ইবনে আবী নুসআর নিহত হবার বেদনাদায়ক সংবাদ পৌঁছল এবং তার অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা মিলীনের দুঃখজনক পরিণতির কথা সে জানতে পারল

তখন নিশ্চিতভাবে বুঝে নিল যে, যুদ্ধের ডংকা বেজে গেছে ...

এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হল যে, ইসলামের সিংহপুরুষ আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) সকাল বিকালের যে কোন মুহূর্তে তার রাজ্যে আক্রমণ করবেন ...

তাই সে তার রাজ্যের প্রতি বিঘত ভূমি রক্ষার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে লাগল ...

নিজেকে ও নিজের দেশকে হেফাজত করার জন্য সতর্কতার সাথে তৈরী হতে লাগল ...

কারণ সে এই আশংকায় শংকিত ছিল যে, তার হতভাগ্য কন্যার মত তাকেও বন্দী করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে দামেস্কের দারুল খিলাফাতে।

অথবা তাঁর শির কোন পাত্রে নিয়ে দামেস্কের বাজারে বাজারে ঘুরানো হবে যেমন ঘুরানো হয়েছিল স্পেনের বাদশাহর মাথা।

*　　*　　*

আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) সম্পর্কে ডিউকের ধারণা ভুল প্রমাণিত হল না। তিনি তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে বাতাসের গতিতে উত্তর আন্দালুস থেকে রওয়ানা হলেন।

বিরনিয়া পাহাড় থেকে বাধভাঙ্গা বন্যার মত দক্ষিণ ফ্রান্সে ঝাপিয়ে পড়লেন।

তখল তাঁর সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ

তাদের প্রত্যেকের বুকের মাঝেই ছিল সিংহের হৃদয়

তাদের শিরা-উপশিরায় বিরাজ করছিল মযবুত প্রতিজ্ঞা।

* * *

মুসলিম বাহিনী 'রোন' নদীর তীরে অবস্থিত 'আরেল' শহরের অভিমুখী হল।

কেননা আরেল শহরে তাদের একটা বুঝাপড়া ছিল

কারণ আরেলবাসী মুসলমানদের সাথে সন্ধি করেছিল এবং জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু টুলুস রণাঙ্গণে যখন সাম্হ ইবনে মালিক শাহাদাত বরণ করলেন এবং মুসলমানগণ তার শাহাদাতে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ল তখন তারা আনুগত্য বর্জন করল এবং চুক্তি ভঙ্গ করে জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানাল।

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) আরেল শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে দেখতে পেলেন উকতানিয়ার ডিউক তার বিশাল সমরশক্তি নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে।

সীমান্তে বিশাল সৈন্য সমাবেশ করেছে।

ইসলামী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অপেক্ষা করছে।

এরপর অল্প কিছু সময়ের মধ্যে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল এবং দুই বাহিনীর মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ বেধে গেল।

এর মাঝে আব্দুর রহমান গাফেকী তার বাহিনীর একদল চৌকষ মুজাহিদ নিয়ে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করলেন। এ মুজাহিদ দলটির অবস্থা

ছিল এই যে, শত্রু বাহিনীর কাছে জীবন ছিল যেমন প্রিয়, ঠিক তাদের কাছে শহীদী মৃত্যুও ছিল তেমনই কাম্য।

তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে শত্রুর পা কেঁপে উঠল

তাদের সারি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল

এই সুযোগে আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) যুদ্ধ করতে করতে শহরে ঢুকে পড়লেন।

শহরবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলেন ...

এবং বিপুল পরিমাণ গণীমতের মাল লাভ করলেন।

আর ডিউক তার বেঁচে যাওয়া অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে পালিয়ে গেল।

মুসলিম বাহিনীর সাথে পূণরায় যুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল।

কারণ তিনিও জানতেন আরেল শহরের এ লড়াই চূড়ান্ত লড়াই নয়। এটা মাত্র শুরু।

* * *

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে 'নাহরে জারুন' পার হলেন এবং তার বিজিত সেনাবাহিনী সমগ্র উকতানিয়া প্রদেশে চক্কর দিতে লাগল।

শীতকালে বাতাসের মৃদু ঝাপটায় গাছের শুকনো পাতা যেমন ঝড়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে প্রতিটি শহর, বন্দর, প্রতিটি জনপদ আব্দুর রহমান গাফেকীর হাতে পতন হতে লাগল।

সাথে সাথে মুজাহিদ বাহিনী পূর্বের গণীমতের মালের সাথে আরও মাল লাভ করল। যা ইতিপূর্বে তারা চোখেও দেখেনি ...

কানেও শোনেনি ...

উকতানিয়ার ডিউক এই বিশাল বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করল এবং তাদের সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হল।

কিন্তু মুসলিম বাহিনী অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদেরকে নির্মমভাবে পরাজিত করল

তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিল

তাদের সেনাবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দিল

ফলে তাদের সেনাবাহিনী তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল পরাজিত। আরেক দল নিহত। আরেক দল বন্দী।

* * *

এরপর হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) তাঁর বাহিনী নিয়ে 'বোদৌস' শহর অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। বোদৌস শহর ছিল উকতানিয়ার রাজধানী এবং ফ্রান্সের অন্যতম বড় শহর।

বোদৌস শহরের গভর্নরের সাথেও তিনি এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। যে যুদ্ধের ভয়াবহতা আগের যুদ্ধগুলোর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।

দুই বাহিনীই একে অপরের উপর এমন প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করল যাতে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।

কিন্তু মুজাহিদ বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় অন্যান্য শহরের মত এই শহরটিরও পতন হল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বোদৌস শহরের গভর্নরও অন্যান্যদের সাথে নিহত হলো।

মুসলিম বাহিনী বোদৌস শহরে এতো বিপুল পরিমাণ গণীমত লাভ করল যা তাদের দৃষ্টিতে পূর্বের লাভ করা গণীমতের মালকে একেবারে তুচ্ছ করে দিল।

বোদৌস শহরের পতন হয়েছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শহরের পতনের কারণে।

তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল 'লিয়ন, বিযানসোন এবং সান্স'।

শেষোক্ত শহরটি প্যারিস থেকে একশত মাইলের বেশী দূরে ছিল না।

* * *

কয়েক মাসের মধ্যেই দক্ষিণ ফ্রান্সের অর্ধেক এলাকা মুসলমানদের হাতে পতন ঘটায় গোটা ইউরোপ কেঁপে উঠল।

ইউরোপের অধিবাসীরা আকস্মিক বিপদের সামনে চোখ মেলল।

ফলে 'ঘোষক' প্রতিটি স্থানে গিয়ে অক্ষম সক্ষম সবাইকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানাল। প্রাচ্য থেকে ধেয়ে আসা এই দুর্যোগের মুখে বুক টান করে দাঁড়াবার আহ্বান করতে লাগল।

যদি তরবারি দিয়ে সম্ভব না হয় তবে নিজেদের বুক পেতে তাদের মুকাবিলা করার জন্য উৎসাহিত করতে লাগল।

যুদ্ধের সরঞ্জামাদি যদি না থাকে তাহলে নিজেদের শরীর দিয়ে হলেও তাদের পথ রোধ করার আহ্বান জানাল।

ইউরোপের অধিবাসীরাও তাদের ডাকে সাঁড়া দিল।

শার্ল মাতিলের নেতৃত্বে একই পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল। তাদের সাথে ছিল গাছের ডাল, পাথর, কাটা এবং বিভিন্ন অস্ত্র।

* * *

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.)-এর বাহিনী তখন 'তোর' শহরে পৌঁছে গেছে। তোর শহরটি ছিল ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। যেমনি ছিলো তা ঘনবসতিপূর্ণ, তেমনি ছিল তাতে সুরম্য প্রাসাদ-অট্টালিকা মজবুত ঘরবাড়ী। ইতিহাসেও রয়েছে এই শহরের একটি বিশেষ অবস্থান

উপরন্তু তোর শহরের সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় হল তার বিশালাকৃতির গির্জা। সেগুলোকে নির্মাণ করা হয়েছিল বিভিন্ন প্রত্মতত্ব ও মূল্যবান সামগ্রী দ্বারা।

মুসলিম বাহিনী এই শহরটিকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল

প্রচন্ড বেগে শহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল

বিজয়ের নেশায় তারা পাইকারী দরে তাদেরকে হত্যা করতে লাগল...

ফলে অল্প সময়ের মধ্যে শার্ল মার্তিলের চোখের সামনেই শহরটির পতন হল।

* * *

একশত চার হিজরীর শাবান মাস। হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী রহ. তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে 'বুয়াতীহ' শহরের উপর প্রচন্ড আক্রমণ করলেন।

এই যুদ্ধেই আব্দুর রহমান গাফেকী শার্ল মার্তিলের নেতৃত্বে ইউরোপের বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা করেন।

উভয় বাহিনীর মধ্যে এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, যার নযীর শুধু মুসলিম এবং ইউরোপবাসীর ইতিহাসেই নয়, সমগ্র মানবেতিহাসেও পাওয়া যাবে না।

* * *

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকীর বাহিনী তখন বিজয়ের শীর্ষ চূড়ায় অবস্থান করছিল।

কিন্তু অফুরন্ত গণীমতের মালে তাদের পিঠ ভারি হয়ে গিয়েছিল

আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) ভয় ও শংকা নিয়ে তাকালেন এই বিপুল পরিমাণ সম্পদের দিকে।

এ সম্পদ দেখে তিনি মনে মনে শংকিত হয়ে পড়লেন।

কারণ যুদ্ধের সময় এই ধন সম্পদ যে তাদের মনযোগে ব্যাঘাত ঘটাবে না এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না।

তিনি আশংকা করছিলেন যে, যুদ্ধের সময় হয়তো এ সম্পদ তাদের মনযোগকে বিক্ষিপ্ত করে দিবে

তারা এক চোখ রাখবে শত্রুর উপর আর আরেক চোখ রাখবে এই গণীমতের মালের উপর

তাই তিনি একবার ইচ্ছা করলেন, যে সমস্ত সম্পদ থেকে তাদের মালিকানা প্রত্যাহার করে নিবেন

কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করলেন, না, এতে তাদের মন সায় দিবে না।

এবং এ যুদ্ধে তারা রাজি হবে না

তাই কোন উপায়ন্তর না দেখে সর্বশেষ এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট তাবুতে এই ধন-সম্পদ রাখা হবে।

এবং যুদ্ধ শুরু হবার আগেই সেনাবাহিনীর পিছনে তা রেখে দেয়া হবে।

* * *

কয়েকদিন যাবত দুই বাহিনীই মুখোমুখি অবস্থান করছে। কেউ কারও উপর আক্রমণ করছেনা। মুখোমুখি দুটি পাহাড় যেমন শান্তও ধীরস্থীরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তারাও সেভাবেই দাঁড়িয়েছিল।

তবে উভয় বাহিনীই সদাসতর্ক। কেননা যে কোন সময় যে কোন বাহিনীই প্রতিপক্ষের উপর চড়াও হতে পারে।

এভাবে যখন সময় দীর্ঘ হতে লাগল তখন হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) দেখলেন, তার সেনাবাহিনীর মধ্যে আত্মমর্যদাবোধের আগুন জ্বলে উঠছে। তাই নিজ সেনাবাহিনীর বীরত্ব ও সাহসীকতার উপর নির্ভর করে তিনিই প্রথমে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কারণ তিনি তো সব জায়গাতেই বিজয় লাভ করে আসছিলেন।

* * *

হযরত আব্দুর রহমান গাফেকী (রহ.) তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ইউরোপীয়দের উপর প্রচন্ড আক্রমণ করলেন।

ইউরোপের যোদ্ধারাও অটল অবিচল পাহাড়ের মত তাদের প্রতিরোধ করল।

কিন্তু কোন ফয়সালা হল না। প্রথম দিন এভাবেই চলে গেল।

রণাঙ্গণে অন্ধকার নেমে তাদের যুদ্ধ থামিয়ে দিল।

দ্বিতীয় দিন আবার নতুন করে যুদ্ধ আরম্ভ হল। মুসলিম বাহিনী ইউরোপের যোদ্ধাদের উপর তীব্রবেগে হামলা করল। কিন্তু তারা কোনরূপ সফলতা লাভ করতে পারল না।

এভাবেই সাতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। কিন্তু কোন পক্ষই কোনরূপ সুবিধা করতে পরলনা।

কিন্তু অষ্টম দিনে মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত তীব্র বেগে তাদের উপর হামলা করল।

তাদের সারিতে একটি বিরাট ফাটল ধরাতে সক্ষম হল। অন্ধকারের বুক চিরে যেমন প্রভাতের আলো বেরিয়ে আসে তেমনিভাবে সেই ফাটল দিয়েও তারা বিজয়ের আলো দেখতে পেল।

ঠিক এমন সময় একদল ইউরোপীয় সৈন্য মুজাহিদ বাহিনীর পিছনে রাখা গণীমতের মালের উপর আক্রমণ করে বসল।

মুসলিম বাহিনী যখন দেখল, তাদের গণীমতের মাল শত্রুবাহিনীর হাতে চলে যাচ্ছে

তখন তাদের অনেকেই সে মাল রক্ষার জন্য সেদিকে দৌড়ে গেল।

ফলে তাদের সারি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল

তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল

তারা শক্তি সাহস হারিয়ে ফেলল ...

তখন আব্দুর রহমান গাফেকী রহ. তাদের ফিরিয়ে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন

শত্রুদের প্রতিহত করতে...

সারির ফাঁক বন্ধ করতে

আব্দুর রহমান গাফেকী যখন ঘোড়ায় চড়ে এভাবে তাদের ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছিলেন

এদিক সেদিক যাচ্ছিলেন ...

ঠিক এমন সময় একটি তীর এসে বিধল তাঁর গায়ে। ফলে সাথে সাথেই তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন ...

এবং রণাঙ্গনেই শাহাদাত বরণ করলেন।

মুসলিম বাহিনী যখন দেখল, তাদের সেনাপতি শহীদ হয়ে গেছেন তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তাদের মধ্যে প্রকম্পন শুরু হল।

আর শত্রুরা তাদেকে পিষে মারতে লাগল। যারা প্রাণে বেঁচে গেল একমাত্র রাতের অন্ধকারই তাদেরকে রক্ষা করেছিল।

* * *

পরদিন সকালে শার্লমার্তিল দেখল, মুসলমানগণ "বুয়াতীহ" ছেড়ে চলে গেছে।

তাই কেউ আর তাদের পশ্চাদ্ধাবনের সাহস করলো না ...

যদি কেউ তাদের পিছু নিতো তাহলে একেবারে তাদের কে শেষ করে দিতে পারতো ...

কিন্তু তারা মনে করল যে, মুসলমানদের এই ফিরে যাওয়াটা তাদের একটা যুদ্ধ কৌশল মাত্র

তাই এ বিজয় নিয়েই খুশি রইল এবং তাদের পিছু না নিয়ে নিজের এলাকায় থাকাই সমিচীন মনে করল।

"বালাতুশ শুহাদার দিনটি ছিল ইতিহাসের একটি দুঃখজনক অধ্যায়।

কারণ মুসলমানগণ এদিন তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ধবংস করে দিয়েছে ...

এর মাঝ দিয়ে এক মহান সেনাপতিকে হারিয়েছে ....

এর মাধ্যমে আবার উহুদের মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল

এটাই আল্লাহর রীতি।

আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন নেই।

* * *

"বালাতুশ শুহাদার" দিনে মুসলমানদের মর্মান্তিক বিপর্যয় প্রতিটি মুসলমানের অন্তরকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল।

তার ভয়াবহতা তাদের হৃদয়কে প্রবলভাবে প্রকম্পিত করেছিল।

ফলে প্রতিটি শহরে, প্রতিটি জনপদে ও প্রতিটি গৃহে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল।

এই আঘাত তাদের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে এবং আজও সেখান থেকে রক্ত ঝরছে

যতদিন পর্যন্ত একজন মুসলমানও এই পৃথিবীর বুকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ রক্ত ঝরবে।

* * *

তবে মুজাহিদদের এই বিপর্যয় যে শুধু মুসলমানদের ব্যথীত করেছে এবং মুসলমানদের অন্তরেই আঘাত করেছে তা নয়

বরং ইউরোপের কিছু বিবেকবান দূরদর্শী লোকের অন্তরেও তা আঘাত করেছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের পিতৃপরুষের এই বিজয়কে তারা মানব সভ্যতার জন্য বিরাট এক মুসীবত ও বিপর্যয় রূপে ধরে নিয়েছিল, যা ইউরোপের হৃৎপিন্ডে আঘাত করেছে।

এ ব্যাপারে যদি তোমরা তাদের মতামত জানতে চাও তাহলে পত্রিকার সম্পাদক হেনরী দী শামবুন এর দিকে ফিরে তাকাও। তিনি বলেন

যদি শার্ল মার্তিল আরব মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ না করত তাহলে আমাদের রাজ্য দীর্ঘ দিন পর্যন্ত প্রস্তর যুগের অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত না

এতো রক্তপাত হতনা

যদি বুয়াতীহ্ প্রান্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই বিজয় অর্জিত না হত তাহলে স্পেন ইসলামের কালজয়ী আদর্শ উপভোগ করতে পারত।

এবং প্রায় আটযুগ পর্যন্ত তাদের অগ্রগতি থেমে থাকত না।

তবে আমাদের এই বিজয় সম্পর্কে যে যাই বলুক না কেন, আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-সভ্যতায় আমরা মুসলমানদের কাছে ঋণী।

আমাদের একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তারাই ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি

আমরা যখন ছিলাম অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এবং এটা একেবারে নিরেট অপবাদ যে, সময়ের চাকা ঘুরে গেছে

আমরা মধ্যযুগে যে অবস্থায় ছিলাম আজ মুসলমানগণ সে অবস্থায় ফিরে গেছে।

এটা শুধুই অপবাদ, শুধুই মিথ্যাচার।

সমাপ্ত

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী

আলোর মিছিল

পঞ্চম খণ্ড

মূল : ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)
অনুবাদ : মাওলানা ইবরাহীম মোমেনশাহী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
রমযান ১৪২৭ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০০৬ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-47-6

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

Alor Michil Vol-5
By: Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha (Rh.)
Translated by: Maulana Ibrahim Munin Shahi
Price Tk. 60.00 U.S. $ 3.00 Only

'আলোর মিছিল'-তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

হ্যাঁ, আলোর মিছিল'ই বটে,
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াততো পুরোপুরিই আলো, আবার তাঁর ঈমানী শিক্ষা যার দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি আর তাঁদের মাধ্যমে তাবেঈগণ জীবন আলোকিত করেছিলেন, সেটাও ছিলো এক সমুজ্জল আলো। সুতরাং আঁধার এই পৃথিবীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ছিলেন যথার্থই সমুজ্জল আলোর মিছিল।

আলোর মিছিল গ্রন্থখানি তাবেঈদের জীবন-চরিতমূলক একটি শ্রেষ্ঠ রচনা, যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে হিদায়াতের আলো। এতে রয়েছে বিখ্যাত তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত চমৎকার জীবন কাহিনীর দ্যুতিময় উপস্থাপনা। আলোর মিছিল তার পাঠককে শোনায় তাঁদের তাকওয়া-পরহেযগারী, সংযম-সাধনা ও নিষ্ঠার শ্লোগান। প্রতিটি জীবনই বিবৃত করে তাঁদের মৃত্যুর স্মরণ, মানবকল্যাণ ও অপূর্ব আত্মত্যাগপূর্ণ পবিত্র জীবনের জয়গান। আলোর মিছিলের প্রতিটি কাহিনীই পাঠক হৃদয়ে রেখে যায় জীবন গঠন ও আত্ম উন্নয়নের এক দীপ্ত আহ্বান।

মহান ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী পড়তে যারা ভালবাসেন, আলোর মিছিল তাদের সেই ভালবাসাকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দেবে আরো বহুগুণ। এমনকি যারা জীবন কাহিনী পড়তে অপছন্দ করেন 'আলোর মিছিল' তাদেরও অপছন্দ হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সবশেষে বলি- দ্বীন ইসলামও একটি আলো যারা সে আলোকে পছন্দ করেন কিংবা যারা মুসলমান হয়েও ক্ষণিকের মোহে সে আলো থেকে সরে আছেন দূরে-অন্ধকারে, সকলের কাছেই আমন্ত্রণ রইলো আসুন শামিল হই 'আলোর মিছিলে'।

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫